কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সন ১৩১০, ২৮ শ্রাবণ।

ভারতবর্ষে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও ভাষান্তরিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সন ১৩১০।

মূল্য ॥০ আনা।

সূচিপত্র।

ভারতবর্ষে।

কলিকাতা, দার্জ্জিলিং ও সিংহল।

দুই বৎসর হইল আঁন্দ্রে শেভ্রিয়োঁ নামক একজন ফরাসিস্ পর্য্যটক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান ও অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম, রীতিনীতি পরিদর্শন করিয়া তাঁহার মনে যখন যে ভাব উপস্থিত হইয়াছে তাহা তিনি অতি সরস ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার লেখার ধরণ অতীব মনোরম। তাঁহার বর্ণনাশক্তি চমৎকার। তাহাতে চিত্রকরের নিপুণতা লক্ষিত হয়। দুই একটা সামান্য আঁচড় দিয়া এক-একটা ছবি কেমন জলন্তরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার বাহ্যপ্রকৃতির বর্ণনা কবিত্বরসে পূর্ণ। তাঁহার আর একটি প্রধান গুণ এই, বিদেশীয় আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম প্রভৃতির সমালোচনায় তাঁহার লেখায় কোনপ্রকার সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পায় না। তিনি যতদূর পারিয়াছেন, ভিতর পর্য্যন্ত তলাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া সহৃদয়ভাবে ও উদারভাবে সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। এরূপ উদারতা বোধ হয় ফরাসীদিগের জাতীয় ধর্ম্ম। ইংরাজ পর্য্যটকদিগের লেখায় এরূপ ভাব সচরাচর দেখা যায় না।

দার্জ্জিলিঙ্গের ইংরাজ-সমাজের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন—

"এই 'অ্যাসেম্ব্‌লি-রুম্‌স্‌'-এ সন্ধ্যাকালে নৃত্য হয়—সেই সময়ে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে রসালাপ চলে, এবং সেই রসালাপ পরিণামে বিবাহে পর্য্যবসিত হয়। ... ... এই দেখ সৈনিকের দল—রাঙ্গা-মুখ, ব্যায়াম-গঠিত সবল শরীর, চুল পমেটমলিপ্ত,—উহারা বারিকে জেণ্টল-ম্যানের মত বাস করে—ছড়ি হাতে, অবৈতনিকের ভাবে, বিজেতৃভাবে সদর্পে পায়চালি করে। এই দেখ ভদ্র 'বোর্ডিং হাউস্‌'। দিনান্ত-ভোজনের উপলক্ষ্যে সবাই কালো কোর্ত্তা পরিয়াছে। বাড়ির কর্ত্রী ভোজনের আরম্ভে দস্তুরমত প্রার্থনা উচ্চারণ করিতেছেন, এবং মাংসের পাৎলা-পাৎলা, চাক্‌লা কাটিয়া ও চাপ্‌-চাপ্‌ 'পুডিং'-এর টুক্‌রা সকলের পাতে শিষ্টতা-সহকারে চালান করিতেছেন। গৃহস্বামী, যাঁহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত বলিলেই হয়, অথচ যাঁহার না থাকাটাও ভাল দেখায় না—তিনি গৃহের সম্ভ্রম মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই যেন অধিষ্ঠিত। ভোজনকালে শান্তভাবে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল—সে কথাবার্ত্তা সুশিক্ষিত, শান্ত ও সামাজিক লোকদিগেরই উপযুক্ত। আহারের পর বৈঠকখানায় যাওয়া গেল। একটি যুবতী মহিলা পিয়ানো বাজাইতে বসিলেন। কতকগুলি প্রেমের গান ও স্বদেশের গৌরব-সূচক গান বাজান হইল। পরদিনে কোথায় ভ্রমণ করা যাইবে স্থির করিয়া মজ্‌লিস্‌ ভঙ্গ হইল। ইহার সহিত টন্‌কিন ও ট্যুনিস্‌ প্রভৃতি ফরাসী উপনিবেশের তুলনা করিয়া দেখ। ফরাসী ঔপনিবেশিকেরা প্রায়ই অবিবাহিত। তাহাদের যেন সময় কাটে না—প্রবাসের কষ্ট তাহারা কি তীব্ররূপেই অনুভব করে। এখানে ইংরাজেরা যেন ইংলণ্ডেই রহিয়াছে। শুধু যে তাহাদের অনুষ্ঠান, তাহাদের অভ্যাস, তাহাদের জাতীয় সংস্কার এখানে আনয়ন করিয়াছে তাহা নহে, নিজ জন্মস্থানের বহির্দৃশ্য ও সাজসজ্জা পর্য্যন্ত যেন এখানে উঠাইয়া আনিয়াছে।

ভিন্ন দেশের সংস্পর্শে তাহাদের স্বভাবের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। আসল কথা, ইংরাজেরা যেরূপ দুর্নম্য এমন কোন জাতিই নহে—নূতন অবস্থার সহিত আপনাদিগকে উপযোগী করিয়া লইতে উহারা নিতান্ত অক্ষম। আপনাদের যে ছাঁচ, যে ব্যক্তিগত ভাব, তাহা কিছুতেই তাহারা ছাড়িতে পারে না। ইহা হইতেই তাহাদের এত নৈতিক বল। কতকগুলি অপরিবর্ত্তনীয় সংস্কার থাকাতেই তাহাদের ইচ্ছার এত বল, কিন্তু আবার এই কারণেই তাহাদের সহানুভূতি ও বুদ্ধির বিকাশ সীমাবদ্ধ। ইহারা এদেশীয় লোকদিগকে একেবারেই বুঝে না, এবং বুঝিতে চেষ্টাও করে না। নিজ সভ্যতার উচ্চভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া এদেশীয় লোকদিগকে অর্দ্ধ-অসভ্য 'পৌত্তলিক' বলিয়া নিরীক্ষণ করে। এই 'পৌত্তলিক' শব্দটি কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি পার্সী সকলের প্রতি নির্ব্বিশেষে উহারা প্রয়োগ করিয়া থাকে। ... ... এদেশীয় লোকের মধ্যে উহারা কেবল কুলি কিম্বা খানসামার মূর্ত্তিই দেখিতে পায়—উহারা মনে করে, এদেশীয় লোকেরা মোট বহন ও জুতা সাফ করিবার পক্ষেই ভাল। দেশের সম্বন্ধেও উহাদের এই ভাব। উহারা এই দেশকে কেবল ব্যবসা বাণিজ্যের স্থান—কৃষিক্ষেত্ররূপেই দর্শন করে।"

কলিকাতা দেখিয়া তাঁহার প্রথম সংস্কার কিরূপ হইয়াছিল তাহা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।—"কলিকাতায় তিনদিন। লোকের জনতায় হতবুদ্ধি ও গ্রীষ্মের তাপে প্রপীড়িত হইয়া কিছুই দেখি নাই। কেবল একটা সাদা রং-এর অনুভব মনের উপর ভাসিতেছিল। সাদা আলো, সাদা বাড়ি, সাদা-কাপড়পরা লোকের স্রোত রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। ... ... দোকান, আফিস, ব্যাঙ্ক, গাড়ি-ঘোড়া, দেয়ালে-মারা বিজ্ঞাপনের সংখ্যা দেখিয়া মনে

হয় যেন লণ্ডন কিম্বা প্যারিস-নগরের এক্স্‌চেঞ্জের নিকটে আছি। প্রভেদ এই, বড় বড় কালো-কোর্ত্তাপরা, নলাকার-টুপিপরা য়ুরোপীয়ের বদলে সাদা ধুতি-পরা, ক্ষুদ্র, শীর্ণ, সুকুমার স্ত্রীসুলভ মুখশ্রীসম্পন্ন বাঙ্গালীদিগের কলরব। ইহারা সিংহলবাসীদিগের মত অলস ও নিদ্রালু নহে, পরন্তু কর্ম্মশীল, চটুল, দ্রুতগামী ও জীবন-উদ্যমে পরিপূর্ণ। পেন্সিলবিক্রেতা 'হকার' হইতে ফিটেনে-ঠেসান-দেওয়া স্থূলদেহ বাবু পর্য্যন্ত সবাই অর্থের চেষ্টায় ফিরিতেছে। দেখিয়া বেশ অনুভব হয়, কলিকাতা নগর একটি প্রধান বাণিজ্যের স্থান—পৃথিবীর একটি মহা বিপণি।

এসিয়া ও লণ্ডনের এই সংমিশ্রণ বড়ই অদ্ভুত। এক-এক সময়ে মনে হয় যেন লণ্ডনের ওয়েষ্টএণ্ডে হাউড্‌পার্কের নিকটে আছি। সেই রকম বড় বড় সোজা রাস্তা, সেই রকম উত্তুঙ্গ প্রাসাদ, সেই রকম গ্রীসীয় স্তম্ভযুক্ত গাড়িবারাণ্ডা, সেই রকম বিস্তৃত পদচারণ-পথ, সেই রকম রেল-ঘেরা চৌকোণা নগরাঙ্গন, রাস্তার কোণে কোণে প্রতিষ্ঠিত সেই রকম ইংরাজি প্রস্তরমূর্ত্তি।"

গ্রন্থকার এক স্থানে ইংরাজের সহিত হিন্দুর তুলনা করিয়া বলিয়াছেন:—"ইংরাজেরা এরূপ দুর্নম্য ও কঠিন যে, বিশ কোটি হিন্দুদিগের মধ্যে হারাইয়া গিয়াও উহাদের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই; পক্ষান্তরে হিন্দুরা লক্ষ ইংরাজের সংস্পর্শেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কলিকাতায় দেশীয় লোকেরা ইংরাজিতে গ্রন্থ লিখিতেছে, সংবাদপত্র চালাইতেছে দেখিলাম; শুধু যে তাহাদের ইংরাজি চমৎকার তাহা নহে—তাহাতে ইংরাজি ধরণ-ধারণ, ভাব-ভক্তি, ইংরাজি ধরণের ভাবনা, ইংরাজি ধরণের অনুভব সমস্তই বজায় দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন প্রবন্ধ পাঠ করিয়া মনে হয় যেন লণ্ডনের কোন উৎকৃষ্ট সমালোচনী-পত্রিকার

সম্পাদক কোন পাদ্রির লেখনী হইতে নিঃসৃত। এরূপ কতকগুলি ছাঁচ-গ্রাহী আর্টিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা নিজত্বসম্পন্ন কোন প্রতিভাশালী ব্যক্তির সহিত কিছুকাল কথা কহিয়াই তাহার ধরণ-ধারণ, হাব-ভাব, কেতার অবিকল নকল তুলিতে পারে। কারলাইল ইঙ্গ-স্যাক্‌সন জাতির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—উহারা 'পাষাণ-গঠিত জাতি'। পাষাণ-গঠিত জাতিই বটে; হিন্দুর কর্দ্দম-ছাঁচে স্বকীয় পাষাণ-মূর্ত্তির ছাপ বসাইয়া উহারা নিজে অবিকৃত রহিয়াছে, অথচ আপনাদিগের প্রত্যেক খোঁচ্-খাঁচ সেই হিন্দুর মৃন্ময় ছাঁচে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে।"

ভারতবর্ষের কতিপয় প্রধান নগরের স্বরূপ-লক্ষণ গ্রন্থকার কেমন বেশ সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন—"কলিকাতা ইংরাজের ভারতবর্ষ; বারাণসী ব্রাহ্মণের ভারতবর্ষ; আগ্রা মোগলদিগের ভারতবর্ষ; আর জয়পুর রাজাদিগের ভারতবর্ষ—উপন্যাসের ভারতবর্ষ।"

ইলোরা-গুহায় মহাদেবের মূর্ত্তি দেখিয়া গ্রন্থকার হিন্দুধর্ম্ম-সম্বন্ধে নিজ মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন;—"সংহার-শক্তি ও সৃজন-শক্তি ব্রাহ্মণদিগের মতে একই শক্তির বিভিন্ন আকারমাত্র; তাঁহাদের সংহারের ও সৃজনের দেবতা পৃথক্ নহে, একই। ইহাই ব্রাহ্মণদের মহা নূতনত্ব। অন্যান্য জাতি মনুষ্যভাবে দেবতাকে দেখিতে গিয়া—ভালমন্দ, সুন্দর কুৎসিত—এইরূপ বিভিন্ন পৃথক্ পৃথক্ আপেক্ষিক লক্ষণে আপনাদিগের দেবতাদিগকে লক্ষণাক্রান্ত করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুরা অসীমের দিক্ দিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের নিকট দেবও নাই দানবও নাই, পরন্তু এক নিরপেক্ষ অসীম শক্তি বর্ত্তমান; তিনিই সৃজন করেন, তিনিই সংহার করেন—তিনিই একমাত্র 'তৎসৎ'। আরও যথাযথরূপে

বলিতে গেলে, হিন্দুদিগের নিকট মৃত্যু একটি পরিবর্ত্তন মাত্র ;— যে পরিবর্ত্তনের সমগ্র শ্রেণীপরম্পরাই জীবন। তাঁহারা যাহা বলেন আধুনিক বিজ্ঞানও তাহাই বলে। জীবন-বিশিষ্ট জীব-বিশেষ এক-একটি আকারমাত্র—উপাদান-পুঞ্জীকরণের বিভিন্ন প্রণালী-মাত্র। আমাদের দেহের কোষাণু লইয়াই আমাদের সমগ্র দেহ ; সেই কোষাণু-সমূহ ক্ষণে ক্ষণে মরিতেছে—তাহাতেই আমরা জীবিত আছি। ... ... সমস্ত জগৎকে মহাসাগরের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তাহাতে অসংখ্য তরঙ্গের হিল্লোল বহিতেছে ; এই প্রত্যেক তরঙ্গ যাহা উঠিতেছে ও পড়িতেছে উহা এক একটি জীবনস্বরূপ—যাহার আরম্ভ ও শেষ আমরা দেখিতে পাই। তরঙ্গসকল যেমন ফেণোচ্ছ্বাসে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, অমনি এক দুর্দ্দম্য শক্তি আসিয়া আবার উহাদিগকে আলোকের দিকে ঊর্দ্ধে উঠাইতেছে। কিন্তু কে না দেখিতে পায়, এই নৃত্যশীল তরঙ্গসকল এক-একটি আকার মাত্র, কারণ প্রতিমুহূর্ত্তেই তাহাদের উপাদান ভিন্ন হইয়া যাইতেছে—তাহাদের মধ্যে বাস্তবিক আর কিছুই নহে, যে-এক অদ্বিতীয় সাধারণ শক্তি তাহাদের মধ্যে আছে তাহাই কেবল বাস্তবিক—তাহাই সমস্ত সাগরকে বিচলিত করিয়া তুলিতেছে। কোন জীববিশেষ এই মহাশক্তির ক্ষণিক বিকাশমাত্র। সে জীব পরিবর্ত্তিত হউক, বিকৃত হউক, মৃত্যুমুখে পতিত হউক—সেই শক্তির তাহাতে কিছুমাত্র আইসে যায় না। সেই একই শিবশক্তি যাহা জগতের আদিম নৈহারিক অবস্থায় কাজ করিয়াছিল, তাহা আজও সূর্য্যে গ্রহনক্ষত্রে বিকাশিত হইয়া আমাদের ভূলোকে মহাদেশরূপে, সমুদ্ররূপে, পর্ব্বতরূপে, জীবরূপে, মনুষ্যরূপে, সমাজরূপে, নগররূপে বিকীর্ণ হইতেছে। সেই একই শিবশক্তি, দৃশ্যমান গতিকে আণবিক গতিতে পরিণত করিয়া

কালসহকারে গ্রহের উপর গ্রহের পতন সংঘটন করিয়া, পরিণামে আপনার সেই অনির্দ্দেশ্য আদিম শক্তিতে ফিরিয়া যাইতেছে—যাহা হইতে সূর্য্য, গ্রহনক্ষত্র, সমুদ্র, মহাদেশ, উদ্ভিজ্জ, সমস্ত জীবপুঞ্জ পুনর্ব্বার নিঃসৃত হইতে পারে। কে বলিতে পারে, এক সৌর-জগৎ ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে আর এক সৌর-জগতের উপর পড়িয়া কালে সমস্ত সৃষ্টিই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না। হিন্দুর প্রজ্ঞা-চক্ষু এই সম্ভাবনীয় নিয়মের একটু আভাস পাইয়াছে; কারণ, তাঁহারা বলেন, কত অসংখ্য যুগে ব্রহ্মার একদিন হয়। সেই কালের মধ্যে নির্গুণ ব্রহ্ম অভিব্যক্ত হইয়া, বিকশিত হইয়া, জীব সৃষ্টি করিয়া, সচেতন হইয়া, পুনর্ব্বার আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া নির্গুণ অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই শক্তির রূপক হিন্দুরা আর কিরূপে কল্পনা করিতে পারে—তাই তাহারা শিবকে 'সৃষ্টিকর্ত্তা প্রলয়কর্ত্তা' বলিয়া সম্বোধন করে।"

গ্রন্থকার হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বাশ্রয়ী ও সর্ব্বসহিষ্ণু উদারভাব ও উহার গঠনপ্রণালী ঠিক ধরিতে পারিয়াছেন। তিনি এক স্থানে এইরূপ বলেন:—"কলিকাতায় একজন ইংরাজ আমার নিকট আক্ষেপ করিতেছিলেন, খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারে তেমন সফলতা হইতেছে না।...... ব্রাহ্মণেরা ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও কৌতূহলসহকারে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকদিগের কথা শ্রবণ করে। উহাদের ধর্ম্ম এরূপ বহুভাবাত্মক ও বহুমতাত্মক যে উহাকে একটি পদার্থ মনে করিয়া ধরিতে-ছুঁইতে পারা যায় না। ইংরাজ মিশনরিরা মুসলমানদিগকে ধর্ম্মের তর্কে যেরূপ পরাস্ত করিতে পারে বলিয়া অভিমান করে, হিন্দুদিগকে সেরূপ পরাস্ত করা অসম্ভব। খৃষ্টীয় প্রচারকেরা যতই কেন প্রতিবন্ধক আনয়ন করুন না, তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের গতিরোধ হওয়া দূরে থাক্, হিন্দুধর্ম্মের জীবনী-শক্তি ও উপযোগিনী-শক্তি এত বলবতী

যে, সেই সকল প্রতিবন্ধককে অনায়াসে আত্মসাৎ ও পরিপাক করিয়া সে আপনার কায়া বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এমন কি, ব্রাহ্মণেরা বলেন, তাঁহারা তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে খৃষ্টকেও প্রবিষ্ট করাইতে পারেন যদি খৃষ্টানেরা এই কথাটি মাত্র স্বীকার করেন যে, য়ুরোপীয়দিগের জন্য বিষ্ণু খৃষ্টের আকারে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইপ্রকারে, কলিকাতার আধুনিক ব্রাহ্ম-সম্প্রদায় স্বাধীন চিন্তাশীল ইংরাজ লেখকদিগের নৈতিক একেশ্বরবাদ অবলম্বন করিয়াছেন। সৃষ্টি হইতে বিভিন্ন ঈশ্বরের অনন্ত অসীম ব্যক্তিগত অস্তিত্ব, জগতের পিতৃবৎ শাসনপ্রণালী, আত্মা ও দেহের ভিন্নতা, পরকালের দণ্ড-পুরস্কার প্রভৃতি সাধারণ দার্শনিক তত্ত্বসকল যাহা আজকাল ইংলণ্ডে প্রচলিত তাহা ঐ সম্প্রদায় আত্মস্থ করিয়াছে! পূর্ব্বকালেও হিন্দুধর্ম্ম এইরূপ বৌদ্ধধর্ম্মকে একেবারে অগ্রাহ্য না করিয়া, পরন্তু উহার সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসের উপকরণগুলি আস্তে আস্তে পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র উহার সার-রসটুকু লইয়া আপনার দেহ পরিপুষ্ট করিয়াছিল। মাধুর্য্য, বিশ্বজনীন দয়াদাক্ষিণ্য,—যাহা ইতরজীব পর্য্যন্ত প্রসারিত—সন্ন্যাসধর্ম্ম, এই সকল লক্ষণের দ্বারা মনে হয়, শাক্যসিংহের আত্মা এখনও ভারতভূমিতে বিরাজ করিতেছে। এইপ্রকারে ভারতের ধর্ম্ম বাঁচিয়া আছে, ও বৃদ্ধি লাভ করিতেছে। এই ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা সুনম্য ও অবস্থানুগামী; এবং ইহা এত জটিল, এত অসংলগ্ন ও পরিবর্ত্তনশীল উপকরণে গঠিত, উহার আকার এরূপ চঞ্চল, এত অনিশ্চিত যে উহাকে একটি-ধর্ম্ম বলিয়া মনে হয় না। এক হিসাবে, উহাকে এক ধর্ম্ম বলাও যাইতে পারে, যেমন বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন জলবায়ুবিশিষ্ট এই বিচিত্র ভৌগোলিক সমষ্টিকে একদেশ বলিতেছি, কিম্বা এই বিচিত্র জাতি ও বর্ণের

সম্মিলনকে আমরা এক হিন্দুজাতি বলিতেছি। এ বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা ঐক্যস্থল আছে। ভারতীয় ধর্ম্মের সূত্রস্থানে অদ্বৈতবাদ প্রথমে সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়; তাহার পর ত্রিশ শতাব্দী কাল ধরিয়া, জিত, ও বিজেতাদের ধর্ম্মমত মিশ্রিত হইয়া গিয়া সেই অদ্বৈতবাদ একটু তিমিরাচ্ছন্ন হইয়াছে; আজিকার দিনে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নৈতিক ও দার্শনিক মতের জাল হিন্দু-ধর্ম্মের মধ্যে বিস্তীর্ণ হইয়া এরূপ প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে যে, উহার শৃঙ্খল আর খুঁজিয়া পাওয়া ভার। এইপ্রকার, ভারতের বিস্তীর্ণ কর্দ্দমময় গঙ্গানদীও বিভিন্ন স্রোতস্বিনীর চির-প্রবাহী স্রোতে পরিপুষ্ট হইয়া, রাশি-রাশি উদ্ভিজ্জাবশেষের ভারে আক্রান্ত হইয়া—বন, জঙ্গল, পুরাতন জনপদ, আধুনিক ইংরাজ-নগর প্রভৃতির মধ্য দিয়া অনিশ্চিত গতিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে; এবং বিস্তৃত ভূমি প্লাবিত ও উর্ব্বরা করিয়া, নানা শাখাপ্রশাখা বিস্তার করতঃ সাগরে মিলাইয়া গিয়াছে।" পাঠককে মূলগ্রন্থ পড়িতে অনুরোধ করি—তাহাতে যে তিনি আমোদ ও উপদেশ একাধারে প্রাপ্ত হইবেন ইহা মুক্ত-কণ্ঠে বলা যাইতে পারে।

(২)

ফরাসী পর্য্যটক আন্দ্রে-শেভ্রিয়োঁ সিংহলদ্বীপ প্রথম যখন জাহাজ হইতে দেখেন তখন তাঁহার কিরূপ মনে হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। "গত কল্য 'কোইট্'-খেলা দুই বাজি হইল, তাহার মধ্যে একটি ছোট ইংরাজ বালিকা,—মুখের রঙ ফ্যাকাসে ও স্বভাব একগুঁয়ে,—কাপ্তেনের নিকট এই অঙ্গীকার করিল, যদি আজ সন্ধ্যার সময় আমরা কলম্বো নগরে

পৌঁছিতে পারি তাহা হইলে সে তাঁহাকে তাহার একটি মুচ্‌কি হাসি দান করিবে। পাঁচটার সময় পূর্ব্বদিকে কুয়াশার ন্যায় অস্পষ্ট কতকগুলা কালো দাগ দেখা গেল। ছয়টার সময় আকাশে বেগ্‌নী রঙের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেঘ-রাশি; সেই মেঘ-ভারাক্রান্ত আকাশের নীচে নারিকেলবৃক্ষসমাচ্ছন্ন একটি নিম্নভূমি দেখা দিল। যতই আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই উচ্চ, সরু বৃক্ষকাণ্ডসকল স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইল। তাহারা একটু হেলিয়া সবেগে যেন আকাশ ফুঁড়িয়া উঠিয়াছে, এবং তালজাতীয় বৃক্ষের রীত্যনুসারে শিরোদেশে শাখাপত্র বিস্তার করিয়াছে। মনে হয় যেন, একটি বিস্তৃত অরণ্য সাগর-গর্ভ হইতে হঠাৎ সমুত্থিত হইয়াছে। এখনও উপকূল এক ক্রোশ দূরে, এখনও মাটি দেখা যায় না—কেবলই ঘোর হরিৎ বর্ণ-রাশি; তীরভূমির নিকটে গিয়াও আর কিছু দেখা যায় না। কেবলমাত্র বিষুবরেখা-প্রদেশ-সুলভ সেই উদ্দাম সরস উদ্ভিজ্জরাশি বর্ষা-সিঞ্চিত ভূমি হইতে সতেজে উত্থিত হইয়া মুক্ত বায়ুর আলিঙ্গনে স্বকীয় হরিৎ করতল প্রসারিত করিয়া আছে।"

সেখানকার "ওরিএণ্টাল" নামক হোটেলে য়ুরোপীয় প্রভু ও দেশীয় ভৃত্যাদিগের যেরূপ রকম-সকম গ্রন্থকার দেখিয়াছেন তাহা অতিসুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। "ওরিএণ্টাল হোটে-লের বাড়িটি প্রকাণ্ড ও বেশ সুখাবাস্য। হোটেল-স্বামীর আদব্-কায়দা খুব দুরস্ত; ভৃত্যদের প্রতি তিনি অল্প কথায় আমাকে যথাস্থানে স্থাপিত করিবার আজ্ঞা প্রচার করিলেন; তাঁহার সেই আজ্ঞা ভৃত্যেরা নীরবে নতমস্তকে গ্রহণ করিয়া আমাকে একটি সৌধ-ধবল বড় কামরা দেখাইয়া দিল। বেশী আসবাব নাই—কেবল একটিমাত্র মশারি-টাঙ্গানো লোহার

খাট ; আর, একটি বেতে-ছাওয়া গভীর-তল আরাম-চৌকি ; নিস্তব্ধ ও দুর্ল্লভ্য সময়ে সেই চৌকির মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে বেশ। কামরার চাঁদোয়া-ছাদে একটি অদ্ভুত দাগ ; প্রথম একটি, পরে দুই তিনটি অচল ক্ষুদ্র টিকৃটিকি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-সহকারে আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। ঘরের আশ-পাশের দীর্ঘ ঢাকা -বারাণ্ডায় ক্ষীণদেহ কোমলাঙ্গ বাঙ্গালী ও সিংহলী ভৃত্যের পাল নিঃশব্দে ও ত্রস্তভাবে যাতায়াত করিতেছে। দীর্ঘকায় গুরুভার-দেহ য়ুরো-পীয়দিগের নিকট, এবং যে সকল প্রশান্ত ও পেশীবহুল ইংরাজ সায়াহ্ন-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, ঝক্‌ঝকে ফ্রিল-দেওয়া সাদা কামিজ বুকের নিকট বাহির করিয়া, মানব অপেক্ষা যেন কোন উৎকৃষ্টতর দুরধিগম্য জীব এইরূপ ভাণ ও ভাবভঙ্গী-সহকারে সেই বৃহৎ ভোজনশালায় প্রবেশ করিতেছিল,—তাহাদিগের নিকট ভৃত্যেরা অত্যন্ত বিনয়াবনত।"

কান্দিনগরে যাইবার সময়ে রেলগাড়িতে ইঙ্গ-বঙ্গের ন্যায় একজন ইংরাজ বেশধারী ইঙ্গ-সিংহলীর সহিত গ্রন্থকারের আলাপ হয়। তিনি বলেন,—"কান্দিতে যাইবার জন্য ট্রেণ ধরিলাম, এবং গাড়ির মধ্যে একজন সিংহলী 'জেন্‌টল্‌ম্যানের' সহিত আলাপ হইল। এই 'জেন্‌টল্‌ম্যানটি' অতি সুসভ্য ; তাঁহার 'টুয়িড্‌' কাপড়ের ফতুয়ার পরিধানে কোন খুঁৎ নাই, এমন কি, একজন লণ্ডনের 'ম্যাশর' তাহা পরিয়া গর্ব্বানুভব করিতে পারেন। তাঁহার বোদামের ছিদ্র 'জার্ডিনিয়া' পুষ্পে ভূষিত ; তাঁহার পদদ্বয় কেবল, সাদা সরু কষা পায়জামার মধ্যে আবদ্ধ। তাঁহার মুখশ্রী প্রায় য়ুরোপীয়। বরং একজন ইটালিয়ান তাঁহার অপেক্ষা অধিক ক্ষীণদেহ, কোমলাঙ্গ ও রৌদ্রদগ্ধ। তাঁহার মুখা-বয়ব-সকল বহিরুন্মুখ ও অস্থিময়। তাঁহার চক্‌চকে শক্ত কালো

কোঁকড়া দাড়ি। সওয়া ঘণ্টা নীরবতার পর, য়ুরোপের রেল-গাড়িতে যেরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপ কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। তিনি আমাকে দেশলাই-বাক্স দিবার জন্য উদ্যত হইলেন এবং বলিলেন, বড় গরম হইতেছে। ইংরাজের দেশে শীতোত্তাপের কথা পাড়িয়াই আলাপের প্রথম সূত্রপাত হয়, এবং দুই জনে আলাপ করিতে হইলে, কথার আরম্ভে এই গৌরচন্দ্রিমা নিতান্তই আবশ্যক। এক্ষণে তিনি কতকগুলি সুস্পষ্ট কথায় সিংহল দ্বীপের লোকসংখ্যা, শাসনপ্রণালী ও ধর্ম্ম আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। ক্রমশঃ যতই তিনি বলিতে লাগিলেন, তাঁহার কথা-বার্ত্তায় আমার ধারণা হইল, ইংরাজি ছাঁচের ছাপ তাঁহাতে কতটা গভীর বসিয়াছে। তিনি আশ্চর্য্য বিশুদ্ধতার সহিত ইংরাজি ভাষায় কথা কহেন—তাহাতে কোনপ্রকার অযথা উচ্চা-রণের টান আছে বলিয়া অনুভব হয় না। ইনি খৃষ্টান্, কৌঁসুলি ও এখানকার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য। ইনি যেরূপ ঘৃণামিশ্রিত কৃপাকটাক্ষ-সহকারে সিংহলবাসী চাষাদিগের অজ্ঞতা ও পৌত্তলিকতার কথা বলিলেন, তাহা ইংরাজ ঔপনিবেশিকেরই মুখে শোভা পায়। তবে, তিনি বলিলেন, পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে অনেকটা পরিবর্ত্তন হইবে; ইতিমধ্যেই রেল-গাড়ি অনেকটা ভাল কাজ করিয়াছে; লোহপথের সম্মুখ হইতে অসভ্য প্রদেশসকল যেন পিছু হটিয়া যাইতেছে। কলম্বোতে আমরা কলিকাতা, বোম্বাই ও বারাণসীর ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি এবং কিছুকাল পরে যখন আমরা উপযুক্ত হইব, জাতীয় নির্ব্বাচন-মূলক পার্লামেণ্ট সভা প্রবর্ত্তিত করিবারও আমাদের ইচ্ছা আছে। তাহা অবশ্য অল্পে অল্পে ক্রমশঃ হইবে। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য হইতে আমরা একেবারে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহি না—কারণ ইংলণ্ডের

প্রসাদেই আমরা সভ্যজগতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আরও এই কথা বলেন যে, তিনি 'আর্য্যজাতীয়'; এবিষয়ে তাঁহার এতটা ধ্রুব বিশ্বাস, যেমন আমার ধ্রুব বিশ্বাস আমি ফরাসিস্। সুতরাং তিনি আপনাকে সকল য়ুরোপীয়দিগের সমকক্ষ এবং অনেক য়ুরোপীয়দিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। যাহাই হউক, ইনি বড় বেশী রকম ইংরেজ; প্রত্যক্ষ দেখা যায়, ইহাঁর নিকট, ইংরাজই যেন মানবজাতির উৎকৃষ্ট আদর্শস্থল। কিন্তু ইংরাজের এতটা অবিকল 'কাপি' বা অনুলিপি আসলে স্বাভাবিক নহে। তা'ছাড়া, তাঁহার পরিহিত সাদা পায়জামা এবং সেই এসিয়াবাসী-সুলভ মুখশ্রীর দুই-এক পোঁচ যাহা তাঁহার মুখে জাজ্বল্যমান, তাহার সহিত এই সমস্ত য়ুরোপীয় বাহ্যাড়ম্বর একটু বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। আসল কথা, একজন লম্বিতবেণী ও নীল রঙ্গের আল-খাল্লা-পরা চীনেম্যান্‌কে ভাল লাগে, তবু জ্যাকেট-পরা ও বিলাতী টুপীপরা জাপানীকে ভাল লাগে না। এই সকল পীত ও কৃষ্ণচর্ম্ম-ধারী লোকেরা যেরূপ আশ্চর্য্য নিপুণতার সহিত আমাদিগের অনুকরণ করে তাহাতে একটু সন্দেহ জন্মে; মনে এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়, এই অনুকরণ শুধু উপরি-উপরি ভাসা-ভাসা, না, তাহা ছাড়াইয়া আরও কিছু দূর যায়?—বাস্তবিক মূলে কি সেই মোগল কিম্বা কাফ্রির রহস্য প্রচ্ছন্ন নাই?—এই ব্যক্তি যেরূপে ঠাণ্ডাভাবে বাক্যোচ্চারণ করেন, ইহাঁর চাল্-চোল্ যেরূপ থট্‌থটে ও অনম্য—ইনি যেরূপ সবিলম্ব আগ্রহ-শূন্য তাচ্ছিল্যভাবের ভঙ্গী-সহকারে সাদা ঝিনুকের বাক্স হইতে সিগারেট চুরোট বাহির করেন, তাহাতে আমি ইহাঁর প্রত্যেক ধরণধারণে আশ্চর্য্য হইতেছি।"

গ্রন্থকার পণ্ডিচারিতে যখন পৌছিলেন, তখন তাঁহার একজন সহযাত্রী ফরাসী-গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী জাহাজ হইতে

নামিতেছিলেন। এই কর্ম্মচারীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য পণ্ডিচারির দেশীয় ও য়ুরোপীয় তাবৎ সম্ভ্রান্ত লোক সমবেত হইয়াছিল। আমাদের দেশে গবর্ণর প্রভৃতিকে অভ্যর্থনা করিবার সময় যেরূপ সৈন্যশ্রেণী রাজপথে দাঁড় করাইয়া দিয়া, বিজয়তোরণ নির্ম্মাণ করিয়া মহাসমারোহে নানা অনুষ্ঠান করা হয়, এখানেও তৎসমস্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—তবে, পণ্ডিচারিতে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের তিন শত মাত্র সৈন্য। এই তিন শত সৈন্য লইয়া অলীক যুদ্ধ প্রদর্শন করা নিতান্ত ছেলেখেলা বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থকার বিদ্রূপের ভাবে বলেন যে, এই সমারোহের সময়ে ঐ সকল সৈনিকেরা বন্দুকের গুঁতার দ্বারা দেশীয় লোকদিগকে সরাইয়া দিতে ও য়ুরোপীয় দেখিলেই সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিতে ত্রুটি করে নাই। সেই নবাগত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর নিকট পণ্ডিচারির বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের দস্তর-মত পরিচয় দান এবং রাজকর্ম্মচারীদিগের সস্মিত বদনমণ্ডলের ভাব প্রভৃতি গ্রন্থকার বর্ণনা করিয়াছেন। যখন সেই পরিচয়দানের অনুষ্ঠান হইতেছিল, মহা জাঁকজমক করিয়া একজন দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নবাগত কর্ম্মচারীর নিকট আসিয়া মস্তক নত করিল। ইহাঁর হস্তে একটি রৌপ্য-দণ্ড ছিল। পূর্ব্বকালের ইংরাজ-ফরাসীযুদ্ধে, ফরাসীদিগের যখন কামানের গোলা ফুরাইয়া যায়, তখন এই ব্যক্তির পূর্ব্বপুরুষেরা রাশি-রাশি খনিজ স্বর্ণপিণ্ড গোলারূপে ব্যবহার করিবার জন্য ফরাসীদিগকে দান করিয়াছিল। তাই তাহার প্রতিদান-স্বরূপ ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সম্মানার্থ একটি রৌপ্য-দণ্ড বক্‌সিস্ করেন। ইহা নিঃস্বার্থ রাজভক্তির একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

গ্রন্থকার এদেশীয় স্ত্রীলোকদের গঠন-সম্বন্ধে এইরূপ বলেন। "এই সকল স্ত্রীলোক সাদাসিধা অথচ জমকাল পরিচ্ছদ পরিধান

করে। ইহারা যখন চলা-ফেরা করে তখন যেমন চক্ষের তৃপ্তি হয়, এমন আর কিছুতে হয় না। মাথায় পিতলের ঘড়া লইয়া যেরূপ ইহারা পশ্চাতে একটু হেলিয়া সটান-ভাবে দণ্ডায়মান হয়, তাহাতে তাহাদের সুন্দর গঠন-রেখাসকল দিব্য প্রকাশ পায়। বিচিত্ররঙের উজ্জ্বলতা সত্ত্বেও, উহাদিগকে দেখিয়া পুরাকালের গ্রীক রমণীদিগকে মনে পড়ে। সেই একই প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দেহভঙ্গী, সেই একই অঙ্গভঙ্গীর প্রশান্ত ভাব—সেই একই মুক্ত বায়ুতে জীবন-যাপন—সেই একই ছোট-ছোট মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘরে বাস। এই সকল ঘর নিম্ন, ঠাণ্ডা, সাদা ধব্‌ধবে, চৌকোণা ও আসবাব-বির-হিত; এবং তাহাদের ছায়ায় বসিয়া রমণীগণ সুতাকাটা কার্য্যে নিযুক্ত।”

গ্রন্থকার পণ্ডিচারিতে ডুপ্লের প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, এবং তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি এই কথা বলেন, “একজন ইংরাজ আমাকে বলেন, ডুপ্লে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি—তিনি আমাদের কিছু কষ্ট দিয়া গিয়াছেন। সীমান্ত-প্রদেশের চতুর্দ্দিকে শুল্ক-আদা-য়ের আড্ডা স্থাপন করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি, এবং আমাদের যত চোর সব পলাইয়া তোমাদের ওখানে বাস করে। এই উপ-নিবেশটি রাখিয়া তোমাদের কি লাভ? একজন ফরাসিস্ তাহার উত্তরে এই কথা বলেন,—লাভ আর কিছুই নয়, ইহার অর্থ এই মাত্র, ভারতবর্ষে ডুপ্লের একটি প্রস্তরমূর্ত্তি থাকা আবশ্যক এবং তাহা তাঁহার নিজ-স্থানেই স্থাপিত হওয়া প্রার্থনীয়।”

সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম।

(৩)

ফরাসিস্ পর্য্যটক আন্দ্রে শেভ্রিয়োঁ সিংহলবাসী বৌদ্ধদিগের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিষয় যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের সারাংশ বেশ অল্পের মধ্যে জানা যায়। তিনি বলেন, "এই কান্দি সিংহলের একটী পুরাতন নগর— সিংহল-রাজদিগের পুরাতন রাজধানী। এই স্থানে বড় বড় তালবৃক্ষের নীচে কৃষ্ণাভ সলিল একটি সরোবর আছে—তাহার ধারে রাজাদিগের পুরাতন প্রাসাদ অবস্থিত। প্রাসাদের সন্নিকট, সেই মরাল-প্রতিবিম্বিত কৃষ্ণ সরোবরের ধারে একটি পুরাতন বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের দ্বারদেশে যে তিনটি বিকট অদ্ভুত মূর্ত্তি রহিয়াছে তাহার অর্থ কি? আর, এই বৌদ্ধ পুরোহিতেরা, যাহারা মন্দিরের মর্ম্মর-শোভিত দালানের উপর দিয়া ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে, ইহারা না-জানি সমস্ত দিন কি চিন্তা করে? মুণ্ডিত-মস্তক, খালি-পা, গেরুয়া-বসনের মধ্য হইতে একটি হাত বাহির-করা, এই বৌদ্ধ পুরোহিতেরা মন্দিরের বাহির-দালানে নিঃশব্দে গমনাগমন করিতেছে। ইহাদের মুখে একটি রহস্যময় অবর্ণনীয় মধুর হাস্য সর্ব্বদাই বিরাজমান। আমার পাণ্ডা আমাকে মন্দিরের কেন্দ্রবর্ত্তী একটি বৃহৎ প্রাঙ্গনে লইয়া গেল। যে 'বো'-বৃক্ষ ধ্যানমগ্ন শাক্যমুনিকে পাঁচ বৎসর কাল ছায়া দান করিয়াছিল, তাহারই একটি চারা এই প্রাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত। এই বৃক্ষের তলদেশে আমি নীত হইলাম। সুধীরে মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া সেই পাণ্ডা আমাকে সেই বৃক্ষ হইতে একটি পাতা ছিঁড়িয়া দিল। কান্দি-মঠের মঠধারী আচার্য্য

শ্রীসুমঙ্গল অত্যন্ত বিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত; ইনি আমাদের য়ুরোপের সমস্ত বিষয় জানিবার জন্য উৎসুক এবং আমাদের চিন্তাশীল লেখকদিগের বিজ্ঞানবাদ এবং দর্শন ও নীতিতন্ত্রের ভাব দেখিয়া মনে করেন যে, তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের অনেকটা নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। আধঘণ্টা কাল ইনি আমার সহিত বাক্যালাপ করিলেন ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান প্রধান গ্রন্থসকলের উল্লেখ করিলেন। বৌদ্ধেরা কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে তাহার কতকটা ভাব তাঁহার কথাবার্ত্তায় জানিতে পারা গেল।

বৌদ্ধদিগের মধ্যে দুই শ্রেণী; এক অভিনবব্রতী সামান্য ভিক্ষু, আর এক বৌদ্ধপুরোহিত শ্রমণ—এই শ্রমণেরা আপনার ইচ্ছাকে বশীভূত করিতে শিখিয়াছে। এই আত্মবশীকরণ-রূপ চরম লক্ষ্য সাধন করিবার জন্য ইহারা 'পিতৃমোক্ষ' নামক গ্রন্থের উপদেশ অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের একটি পুরাতন গ্রন্থ। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা আটটি বস্তু গ্রহণ করিতে পারে; তিনখানি পরিধান বস্ত্র, একটি কটীবন্ধ, একটি কমণ্ডলু, একটি ক্ষুর, একটি ছুঁচ, পানীয় হইতে কীটাদি জীব ছাঁকিয়া ফেলিবার জন্য একটি ছাঁকুনি। মঠের অভ্যন্তরে এই দারিদ্র্য-ব্রতের খুঁটিনাটি সমস্ত নিয়ম যথাশাস্ত্র পরিপালিত হয়। নবব্রতী ভিক্ষু অরুণোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে, নিজ পরিধানবস্ত্র ধৌত করে, মন্দিরের দালান ও বোধী বৃক্ষের (বট) চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি ঝাঁট দেয়, সমস্ত দিনের পানীয় জল উত্তোলন করিয়া তাহা ছাঁকিয়া রাখে; অবশেষে একটি নির্জ্জন স্থানে গিয়া ধ্যান করে। পবিত্র বোধী-বৃক্ষের সম্মুখে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া বুদ্ধদেবের মহৎ গুণসকল এবং নিজের ত্রুটি ও দোষের বিষয় চিন্তা করে; পরে, কমণ্ডলু হস্তে লইয়া, নিজ গুরুর

সমভিব্যাহারে ভিক্ষার্থ বহির্গত হয়। উহারা মুখ ফুটিয়া কিছুই চাহে না—কেবল লোকের দ্বারে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। গৃহে প্রত্যাগত হইয়া, নবব্রতী ভিক্ষু গুরুর চরণ প্রক্ষালন করে, কমণ্ডলু ধৌত করে, চাউল সিদ্ধ করে এবং বুদ্ধের বিষয়—বুদ্ধের দয়া ও ঔদার্য্যের বিষয় চিন্তা করে। এক ঘণ্টা পরে, একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া শিক্ষা-গৃহে প্রবেশ করে—পুরাতন পাণ্ডুলিপির নকল করে, কিম্বা গুরুর পদতলে বসিয়া তাঁহার উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করে এবং দিনের মধ্যে যে সকল দোষ করিয়াছে তাহা তাঁহার নিকট প্রকাশ করে। পুরোহিত-শ্রেণীর বৌদ্ধদিগকে কোনপ্রকার শারীরিক শ্রম করিতে হয় না; তাহারা ধ্যান ধারণায় অনেকটা সময় নিয়োগ করিতে পারে; কিন্তু তাহারা প্রার্থনা করে না; কারণ, বৌদ্ধধর্ম্ম কোন দেবতার সাহায্য চাহে না। দুঃখকষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য উহারা নিজের উপরেই নির্ভর করে। স্পিনোজা ও ষ্টোয়িক-সম্প্রদায় যে উপায় অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন ইহারাও সেই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার জীবের সমষ্টিকে ধ্যান করিবার জন্য ইহারা ক্ষণস্থায়ী 'আমি'-কে ভুলিয়া যায়। পাঁচ প্রকার ধ্যানের দ্বারা ইহারা সমস্ত জগৎকে চিন্তা করে। প্রথম ধ্যান, 'মুক্তি-ভাবনা'। সমস্ত কষ্ট, রিপুর উদ্বেগ, অসৎ বাসনা হইতে মুক্ত হইলে আমি যেমন নিজে সুখী হইতে পারি বলিয়া মনে করি, সেইরূপ সমস্ত জগতের জীব ঐ প্রকারে সুখী হউক্ এই কামনা করা প্রথম ধ্যানের বিষয়। এমন কি, শত্রু হইলেও কেবল তাহার গুণের ভাগ গ্রহণ করিয়া, আমি যে সুখ নিজে চাহি, সে সুখ যেন সেও পায় এইরূপ কামনা অকপট ভাবে করিতে হইবে।

দ্বিতীয় ধ্যান—'করুণা-ভাবনা'। সমস্ত জীব যে কষ্টযন্ত্রণা

ভোগ করিতেছে তাহা মনে করিয়া, আপনার অন্তরে সেই কষ্ট জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে—ইহাই দ্বিতীয় ধ্যানের বিষয়।

তৃতীয় ধ্যান—'মুদিত-ভাবনা'। যে সকল জীব সুখী, কিম্বা মনে করে তাহারা সুখী, তাহাদের বিষয় চিন্তা করিয়া এইরূপ কামনা করিতে হইবে যাহাতে অন্যেরাও তাহাদের মত সুখী হয়, এবং তাহাদের সুখে যাহাতে আপনাকেও সুখী মনে করিতে পারি এইরূপ চেষ্টা করিতে হইবে।

চতুর্থ ধ্যান—'অশুভ-ভাবনা'। শরীরের হীনতা, অশুচিতা, রোগের ভীষণ যন্ত্রণা-সকল মনে করিয়া এইরূপ ভাবিতে হইবে ঃ—সাগর-সম্ভূত ফেনপুঞ্জের ন্যায় এ সমস্ত দুঃখকষ্ট তিরোহিত হয়, অনন্ত জন্মমৃত্যুর পারম্পর্য্য বশতই উহাদের অস্তিত্ব, এই জন্ম-মৃত্যুর পারম্পর্য্যে বাস্তবিকতা কিছুই নাই—উহা অলীক আবির্ভাব মাত্র। শেষ ধ্যান—'উপেক্ষা-ভাবনা'। যাহা কিছু মানুষ ভালমন্দ বলিয়া মনে করে, যাহা কিছু ক্ষণস্থায়ী,—স্বতন্ত্রতা, পরতন্ত্রতা, প্রেম দ্বেষ, ঐশ্বর্য্য দারিদ্র্য, যশ অপযশ, রূপযৌবন, জরা ও রোগ, এই সমস্ত, নিতান্ত উপেক্ষার সহিত, সম্পূর্ণ প্রশান্তভাবে চিন্তা করিবে। ... ... কান্দি নগরের যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম ততই দেখি পথ লোকে লোকাকীর্ণ। রাত্রিকালে, স্ত্রীপুরুষ দলে দলে নগরাভিমুখে আগ্রহের সহিত গমন করিতেছে। নিস্তব্ধতার মধ্যে বৌদ্ধ পুরোহিত এক প্রকার সুর করিয়া জঙ্গলের ও ঘরের লোকদিগকে ডাকিতেছে, আর অমনি লোকসকল পিল্-পিল্ করিয়া কোথা হইতে যে বাহির হইতেছে বোঝা যায় না—বড় বড় গাছে ঢাকা, ঝোপ্‌ঝাপের মধ্যে যে সকল গৃহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, মনে হয়, যেন তাহা হইতেই তাহারা নির্গত হইতেছে। যে সকল ভক্তের দল নিস্তব্ধভাবে পুষ্পভার হস্তে

লইয়া চলিতেছিল, সেই গভীর অন্ধকার রাত্রে আমিও অদৃশ্য-ভাবে তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া গেলাম। কাঁসর ঘণ্টার রবে নগর পরিপূর্ণ—তা' ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যায় না। সেই কৃষ্ণ সরোবরের ধারে, মন্দিরের বৃহৎ দ্বারের নীচে সেই বিকট মূর্ত্তিগুলি চিরজাগ্রত, এবং মন্দিরস্থিত উদ্যানের প্রবেশ-পথে পুরোহিতেরা নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান ও কোনপ্রকার অঙ্গভঙ্গী না করিয়া নীরবে ভক্তদিগের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিতেছে। একটা রৌপ্যময় গরাদের নীচে দিয়া আমরা চলিলাম এবং তৎপরেই একটা ছায়াময় বড় দালানের মধ্যে গিয়া পড়িলাম। সেখানে ছোট ছোট পবিত্র দীপ-সকল একপ্রকার রহস্যময় অস্ফুট আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। শত শত ধূপাধার হইতে সুগন্ধী নীলাভ ধূমরাশি উর্দ্ধে প্রসারিত হইয়া স্থিরভাবে উপরে ভাসিতেছে। এই গুরুভার, নিদ্রাকর্ষক ধূপধূমের প্রভাবে সমস্ত দৃশ্যটি কেমন একপ্রকার অবাস্তব অলৌকিক আকার ধারণ করিয়াছে। অন্ধকারের মধ্যে বুদ্ধদেবের বিবিধ মূর্ত্তি হইতে ছায়া পড়িয়া ইতস্ততঃ অর্দ্ধস্ফুট ভাবে দেখা যাইতেছে। কোন বুদ্ধমূর্ত্তি শয়ান, কোন বুদ্ধমূর্ত্তি আসীন—সকলের তলদেশে পুষ্পরাশি বিকীর্ণ। আমরা একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন সিঁড়ি দিয়া উঠিলাম, তাহার ধারসকল অগ্নিকুণ্ড-নিক্ষিপ্ত কোলাহলময় দানবদৈত্যের চিত্রে চিত্রিত। উপরে একটি রৌপ্যময় গরাদের পশ্চাতে পুরোহিতেরা দণ্ডায়মান—ভক্তেরা তাহাদের পুষ্পোপহার একটি বেদীর উপর রাখিতেছে, আর সেই পুষ্পোপহার পুরোহিতেরা গ্রহণ করিতেছে। সেই নীরব ভক্তদলের সম্মুখে, একটি সুন্দর যুবক পুষ্পোপহার-হস্তে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। মূর্ত্তির সম্মুখে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া সে অনেকবার নতশির হইল। এইবার অর্দ্ধনত হইয়া বক্ষের উপর হস্তযুগল স্থাপন করিয়া খানিকটা স্থির-

ভাবে রহিল। তাহার সুবক্র সুন্দর ওষ্ঠে ও তাহার দীর্ঘায়ত সুন্দর নেত্রে, রহস্যময় মধুর প্রশান্ত হাস্য বিরাজমান। ... ... নিস্তব্ধতা আরও যেন গুরুভার হইয়া উঠিল; কিয়ৎকাল পরেই সহসা তুরী ভেরীর গভীর নিনাদে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল। কিন্তু জনতার মধ্য হইতে কোন শব্দ নাই। পবিত্র দীপাবলীর নিম্নে, পুষ্পরাশির পশ্চাতে, পুরোহিতেরা গম্ভীর ভাবে দণ্ডায়মান।

মন্দিরের বিজন অন্তরতম প্রদেশে, পুরোহিতদিগের পশ্চাতে পবিত্র স্থানে, যোগাসনে উপবিষ্ট একটি বৃহৎ স্ফটিকমূর্ত্তি স্থাপিত—তাহার অবয়ব-রেখাসকল অস্পষ্ট। মূর্ত্তিটি এরূপ স্বচ্ছ যে, উহাকে উপছায়া বলিয়া মনে হয়—মনে হয় যেন জড়ভাব হইতে মুক্ত কোন অশরীরী আত্মা। যে মহাপুরুষ কঠোর সমাধিবলে আপন রক্তমাংসের বন্ধন, কামনার বন্ধন সকল ছিন্ন করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহারই উপযুক্ত মূর্ত্তি বটে! এই মূর্ত্তি জনসাধারণকে শাসন করিতেছে, অথচ কোলাহলময় মনুষ্যের জনতা হইতে দূরে অবস্থিত—এবং ইহার স্বচ্ছ ওষ্ঠাধরে যে অনন্ত মধুর হাস্য বিরাজমান তাহাতে মনে হয়, যাঁহার এই মূর্ত্তি তিনি চিরকালের মত শান্তি-ধামে প্রবেশ করিয়াছেন।

যতই আমি এই দেশ ও দেশের লোকদিগকে দেখিতেছি ততই যেন আমি এই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি বুঝিতে পারিতেছি। আজ যাহা আমাদের য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, ত্রয়োবিংশতি শতাব্দী হইতে বৌদ্ধমুনিরা তাহাই শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বলেন, কিছুই নাই—সকলই হইতেছে। এই জগৎ ক্ষণস্থায়ী আবির্ভাবের প্রবাহমাত্র—পরিবর্ত্তন ব্যতীত ইহাতে আর কিছুই স্থায়ী নহে। পৃথিবী, আকাশ, অষ্টাদশ নরক, দানবগণ ও তাহাদের নিবাসভূমি নিকৃষ্ট লোক-সকল, সকলই নদীর জলের ন্যায়

প্রবহমান। একটার পর আর একটা—এইরূপ ক্রমান্বয়ে এক কালচক্রের পর আর এক কালচক্র, এক যুগের পর যুগান্তর পুনরাবৃত্ত হইতেছে। এই শ্রেণীপরম্পরা অনন্ত—ইহা কস্মিন্ কালেও আরম্ভ হয় নাই, এবং কস্মিন্ কালেও ইহার শেষ হইবে না। এই জগতের মধ্যে 'মনুষ্য' পদার্থটা কি ?—চিন্তাশীল জীব বটে, কিন্তু অন্যান্য জীবেরই মত, অর্থাৎ কিছুকালের জন্য কতকগুলি শক্তি একাধারে সমবেত হইয়াছে—কিছুকাল পরেই উহা বিক্ষিপ্ত ও বিলীন হইয়া যাইবে। 'মনুষ্য' কি ?—এমন কতকগুলি বৃত্তি, ভাব, কামনা, ইচ্ছা, ও সংস্কারের সমষ্টিমাত্র যাহাদিগের মধ্যে কিছুকালের জন্য যোগ ও শৃঙ্খলা রক্ষিত হইতেছে। শরীরের মধ্যেও এইরূপ কোষাণু সকল অনুক্ষণ মরিতেছে, জন্মিতেছে, অথচ সমগ্র শরীরের গঠন কিছুকাল সমান ভাবেই থাকিতেছে। মনুষ্যের মধ্যে কিছুই স্থায়ী নহে। জীবনের ঘটনাসকল—যাহা কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে একত্র হইতেছে ও পরস্পরকে অনুসরণ করিতেছে এবং যাহা লইয়াই মনুষ্যের ব্যক্তিত্ব,—সেই ঘটনাগুলিও স্থায়ী নহে ; কিম্বা যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে এই ঘটনাগুলি ঘটিতেছে তাহারও বৃদ্ধি হ্রাস হইয়া ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন হইতেছে। যে সকল উপাদানের সমষ্টি লইয়া প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তাহা পঞ্চস্কন্ধে বিভক্ত ; এবং বৌদ্ধেরা তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দেন যে, এই স্কন্ধগুলির মধ্যে কোন স্কন্ধই অথবা কোন উপাদানই স্থায়ী নহে। প্রথম স্কন্ধে ভৌতিক পদার্থের গুণসমূহ—যথা বিস্তৃতি, গভীরতা, বর্ণ ইত্যাদি ; ইহারা সাগরোৎপন্ন ফেনরাশির ন্যায় উৎপন্ন হইতেছে ও উৎপন্ন হইয়াই পুনর্ব্বার তিরোহিত হইতেছে। দ্বিতীয় স্কন্ধে ইন্দ্রিয়বোধসমূহ—ইহারাও জলোপরি-নৃত্যশীল বিম্ববৎ। তৃতীয় স্কন্ধে জ্ঞান ও

বুদ্ধিবৃত্তি; ইহারাও দক্ষিণ প্রদেশের অনিশ্চিত মৃগতৃষ্ণিকাসম। চতুর্থ স্কন্ধে মানসিক ও নৈতিক সংস্কারসমূহ—ইহা কদলীকাণ্ডের ন্যায় অসার। শেষ কথা, চিন্তাসকল উপছায়ামাত্র—ঐন্দ্রজালিক মায়ামাত্র। 'গৌতম বলিলেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী পণ্ডিতেরা যে ভাবেই আত্মাকে চিন্তা করুন না কেন, এই পঞ্চ স্কন্ধের অন্যতম স্কন্ধকে, কিম্বা তাহাদের সমষ্টিকেই তাঁহারা আত্মা বলিয়া কল্পনা করেন। এই প্রকারে, হে ভিক্ষুগণ, যাহারা বৌদ্ধ হয় নাই, কিম্বা যাহারা বৌদ্ধধর্ম্ম বুঝিতে পারে না, তাহারা কখন মনে করে, আত্মা ও ভৌতিক গুণ একই; কখনও বা মনে করে, আত্মা ও ইন্দ্রিয়-বোধ একই; এই প্রকারে আত্মাকে অপর শেষ তিনটি স্কন্ধরূপেও কল্পনা করিয়া থাকে। এই প্রকারে, একটার পর আর একটা স্কন্ধ কল্পনা করিয়া, অবশেষে এই সংস্কারটিতে উপনীত হয়—সে কি?—না, আমি আছি, আমার আত্মা আছে; আমি থাকিব কিম্বা আমি থাকিব না; আমার ভৌতিক গুণ থাকিবে কিম্বা থাকিবে না; আমার সংস্কার সকল থাকিবে কিম্বা থাকিবে না। কিন্তু বুদ্ধের জ্ঞানবান শিষ্যেরা, পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধিকারী হইলেও তাঁহারা অজ্ঞান হইতে মুক্ত এবং তাঁহারা সত্যে উপনীত হইয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাদের সংস্কার অন্যরূপ;—আমি আছি, আমার আত্মা আছে, আমি থাকিব কিম্বা থাকিব না, এবম্বিধ সংস্কার তাঁহাদের মানসক্ষেত্রে উপস্থিত হয় না।' ডেকার্ট বলিয়াছেন, আমি চিন্তা করিতেছি, অতএব আমি আছি। কিন্তু বুদ্ধদেব হইলে এইরূপ বলিতেন;—আমি চিন্তা করিতেছি, অতএব আমি নাই। কারণ, চিন্তা কাহাকে বলে? কতকগুলি পরিবর্ত্তনপরম্পরা—বিভিন্ন ঘটনার পারম্পর্য্য ভিন্ন ইহা আর্ কিছুই নহে। আধুনিক মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের ত এই মত। ইংলণ্ডের জন

ষ্টুয়ার্ট মিল এবং ফ্রান্সের টেন এই বিষয় অনুশীলন করিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে, ইহা একপ্রকার কল-কৌশল যাহাতে করিয়া 'আমি' বলিয়া একটা পদার্থ আমাদের মধ্যে আছে এইরূপ বিভ্রম উৎপন্ন হয়। বৌদ্ধেরা বলেন, এই ভ্রমটি সর্ব্বাপেক্ষা হানিজনক, আমাদের ফাঁদে ফেলিবার একটি প্রধান উপায়; কারণ এই বন্ধনেই আমরা বিষয়ের সহিত আবদ্ধ আছি—এই মৃগতৃষ্ণাই আমাদিগকে শান্তি ও উপেক্ষা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নিক্ষেপ করে ও আমাদিগকে ক্রমাগত সম্মুখে ঠেলিয়া লইয়া যায়। বৌদ্ধেরা ইহাকে ব্যক্তিত্বরূপ বিভ্রম বলেন।

একবার যদি স্বীকার করা যায় যে, এই জগৎ কেবল ইন্দ্রিয়াভাসের প্রবাহমাত্র, আমাদের অন্তরে কিম্বা বাহিরে কোন পদার্থই স্থায়ী নহে, তখন আমাদের কর্ত্তব্যও সহজে স্থিরীকৃত হইতে পারে। যে 'আমি' এত গুরুতর বলিয়া আমার নিকট প্রতীয়মান হইত এক্ষণে আমি তাহাকে বিভ্রম বলিয়া জানিতেছি। ইহা জানিবামাত্র মনুষ্য মুক্তিলাভ করে—এই 'আমি' চিরকাল পুষিয়া রাখিবার জন্য সে আর লালায়িত হয় না—সে আর কোন চেষ্টা করে না, কামনা করে না, তাহার জীবন-তৃষ্ণা চলিয়া যায়, সে দুঃখ হইতে মুক্ত হয়।—কারণ, দুঃখ কি?—ব্যক্তিগত অস্তিত্ব হইতেই দুঃখ উৎপন্ন হয়। আর, জন্ম, বার্দ্ধক্য, রোগ, মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনাগুলি লইয়াই আমাদের ব্যক্তিত্ব। আচ্ছা, এই সকল ঘটনায় কেন আমাদের দুঃখ উৎপন্ন হয়? কারণ, আমিরূপ বিভ্রম হইতেই আমাদের বাঁচিবার ইচ্ছা হয়, ভয় ও আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়, জরা মৃত্যু প্রভৃতি দূরীকৃত করিয়া তাহার বিপরীত বিষয় লাভের অভিলাষ হয়। এই অস্তিত্বের অনুরাগ যদি আমাদের অন্তর হইতে নির্ম্মূল করিয়া ফেলিতে পারি; ইচ্ছা কর্ম্ম চিন্তা হইতে বিরত হইয়া পরি-

বর্ত্তনের সার্ব্বভৌমিক নিয়মের হাত হইতে যদি এড়াইতে পারি, তাহা হইলে পরিবর্ত্তনমূলক দুঃখ আর আমাদিগের নিকট আসিতে পারে না। 'যে ব্যক্তি এই ঘৃণিত জীবন-তৃষ্ণাকে দমন করিতে পারে, পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুবৎ দুঃখ তাহা হইতে সহজে অপসারিত হয়।'

এই পূর্ণ অবস্থা লাভের পন্থাগুলি এই;——প্রথম, আত্ম-বিভ্রম ও ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানের বিশ্বাসকে বিনাশ করা। দ্বিতীয়, সমস্ত রিপু, সমস্ত বিদ্বেষ, সমস্ত মায়া-মোহ বিনাশ করা; তৃতীয়, আত্মানুরাগের কোন চিহ্নমাত্র না রাখা; চতুর্থ, ধ্যানবলে মুক্তিলাভ করিয়া ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্বপ্রকার অস্তিত্বের কামনা হইতে বিরত হওয়া। এই স্থলে উপনীত হইতে পারিলেই মনুষ্য মুক্ত হয়। আপনার উপর তাহার আর আস্থা থাকে না, আকর্ষণ থাকে না, অন্যের কাজে আপনাকে সমর্পণ করিতে পারে; ঔদার্য্য, পরদুঃখকাতরতা তাহার মনকে অধিকার করে। যেমন, মাতা, আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া আপনার একমাত্র সন্তানকে রক্ষা করে, সেইরূপ সে বিশ্বজনীন প্রেমের—অসীম পরানুরাগের অনুশীলন করে। এই প্রেম তাহার চতুর্দ্দিকে, তাহার উর্দ্ধে, তাহার নিম্নে বিকশিত হইয়া উঠে—সেই বিশুদ্ধ প্রেম যাহার সহিত স্বার্থের কোন সম্পর্ক নাই। জাগিয়া থাকুক, দাঁড়াইয়া থাকুক, বসিয়া থাকুক, কার্য্য করুক, অথবা শয়ন করুক, সকল অবস্থাতেই সকল সময়েই এই ভাবটি তাহার মনে দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ থাকে।'—'তাহার ইন্দ্রিয় সকল প্রশান্ত হইয়াছে; বশীভূত অশ্বের ন্যায়, সে গর্ব্ব হইতে মুক্ত—তার অজ্ঞান-মলা বিধৌত—দেহের উত্তেজনা, জীবনের উত্তেজনা তাহার আর অনুভব হয় না, দেবতারাও তাহার অবস্থাকে ঈর্ষা করেন।' 'যাহার চরিত্র সবল, সে ধরার ন্যায় অচল—স্তম্ভের ন্যায় অটল—স্ফটিক-স্বচ্ছ সরোবরের ন্যায় প্রশান্ত—

তাহার আর পুনর্জন্ম নাই।' 'যাহারা জ্ঞান-যোগে মুক্ত হইয়াছে, প্রশান্ত তাহাদের বাক্য, প্রশান্ত তাহাদের কার্য্য। তাহারা পর-জন্মের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে না। জীবনের আকর্ষণ তিরোহিত হওয়ায় এবং অন্য কোন কামনা মনে উদিত না হওয়ায়, জ্ঞানীরা তৈলবিরহিত দীপের ন্যায় নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।' ইহাই বৌদ্ধদিগের চরম সুখের অবস্থা। শাক্যমুনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণ আচার্য্য-দিগের ন্যায়, জগৎকে তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন—যতই তলাইয়া দেখেন হাতে কিছুই ঠেকে না—হস্ত হইতে যেন সব সরিয়া যায়, গলিয়া যায়; অবশেষে তাঁহার দৃঢ়মুষ্টিতে কতকটা শূন্য সাপটিয়া ধরিলেন। চারিদিকেই মায়া বিভ্রম বিভাসিত—চারি-দিকেই ঘটনা সকলের চঞ্চল আবর্ত্ত—কিছুই স্থায়ী নহে। প্রকৃতি আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য অজ্ঞান মনুষ্যকে প্রবঞ্চনা করিতেছে—কিন্তু জ্ঞানী তাহাতে ভুলেন না। তিনি নির্ব্বাণ-শান্তির আশ্রয় লইবার জন্য এই ক্ষণস্থায়ী বিষয়-বিভ্রম হইতে দূরে পলায়ন করেন। তাঁহার অন্তরে তিনি এক মহাশূন্য স্থাপন করিয়াছেন—কিছুতেই তাঁহাকে আর বিচলিত করিতে পারে না। তাঁহার ওষ্ঠাধরে যদি কখন চাঞ্চল্যের রেখা দেখা যায়, সে কেবল বিশ্বজনীন ঔদার্য্য ও মানব-দুঃখের জন্য অনুকম্পা-জনিত মধুর প্রশান্ত হাস্যের ঈষৎ বিস্ফুরণ মাত্র।"

---

(৪)

ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রের মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ।

ফরাসী লেখক আন্দ্রে শেভ্রিয়োঁ ভারতের মায়াবাদ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাংশে আমাদের মতের সহিত ঐক্য না হউক্, তাহার মূলে যে অনেকটা সত্য আছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। বৈদিক যুগ হইতে মায়াবাদের সূত্রপাত হইয়া কি করিয়া ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং তাহার বিষময় ফল আমাদের সমাজের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে তাহা তিনি বিশদরূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। একজন বৈদেশিক কিছুকালের জন্য এদেশে ভ্রমণ করিতে আসিয়া আমাদের শাস্ত্রের মর্ম্ম যে যথার্থরূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন ইহা প্রত্যাশা করা যায় না। তবু কতকটা যে তিনি পারিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্য। তিনি দুই একটা কঠোর কথা বলিয়াছেন; তাহা আমাদের শোনা ভাল। তাহাতে উপকার ভিন্ন অপকার নাই। অনেক সময় আমাদের নিজের দোষ গুণ নিজে বুঝিতে পারি না; তাহা বাহিরের লোকের চোখে পড়ে। যাহা হউক, তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে একটু নূতনত্ব আছে। তিনি বলেন, "এই অদ্বৈতবাদ যাহা ভারতবর্ষে দুই হাজার বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে, ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের মত নহে। সমস্ত হিন্দুজাতি সাধারণতঃ জগৎকে যে ভাবে দর্শন করে, তাহাই দার্শনিক ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে মাত্র। ইহা ভাল করিয়া যদি বুঝিতে চাও আর কোন জাতির আভ্যন্তরিক ভাব আলোচনা করিয়া দেখ; ব্রাহ্মণদিগের পুরাতন দার্শনিক কবিতা সকল পাশাপাশি রাখিয়া, বাইব্‌ল্ গ্রন্থখানি একবার পাঠ করিয়া দেখ। তাহাতে কি দেখিতে পাও? আর কিছুই নহে,

কতকগুলি গীতিকবিতা মাত্র; রোষ, দ্বেষ, নিরাশা, উৎসাহ, উচ্ছ্বাস, মনের প্রচণ্ড ভাবসমূহ, আত্মার সমস্ত কম্পন ও আন্দোলন, রূঢ় উপমার দ্বারা ও জ্বলন্ত কল্পনা-সহকারে ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র; তাহার লিখনধারাও বিচ্ছিন্ন ও আকস্মিক এবং ভাষাও অতি সরল ও অস্ফুট; সে ভাষায় দার্শনিক চিন্তার তরঙ্গলহরী অনুসরণ করা সুকঠিন—তাহাতে কেবল অস্ফুট কণ্ঠে মানব-আত্মার আবেগ প্রকাশ করা যায় মাত্র। মনের আবেগ স্থায়ী ও প্রচণ্ড হইলে তাহার ফল কি হয়?—না, মানুষ আপনার উপর ফিরিয়া আইসে। যখন সে যন্ত্রণা ভোগ করে, যখন সে কাহারো প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করে, তখন সে আপনাকে অতিক্রম করিতে পারে না। যে বহির্জগতের সহিত তাহার সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়, সে বহির্জগৎকে সে পৃথক্ ভাবে দর্শন করে। যে আত্মা আবেগপূর্ণ তাহাতে আমিত্ব দৃঢ়রূপে সংলগ্ন থাকে ও পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করে; এই অবস্থাতে সে যখন জগতের মূল তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করে, তখন সে সেই মূলকে স্বতন্ত্র ও সর্ব্বশক্তিমান আত্মা বলিয়াই কল্পনা করে।

"কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের মনের গতি ভিন্নরূপ হওয়ায় তাহাতে ভিন্নরূপ ফল উৎপন্ন হইয়াছে। বেদে কি দেখিতে পাওয়া যায়? তাহাতে কেবল প্রকৃতিবর্ণনামূলক কবিতা,—অরুণ, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, পৃথিবী ইহাদেরই স্তুতিগান। উহা বহির্মুখী, অন্তর্মুখী নহে। উহাতে ব্যক্তিগত হৃদয়ের ভাব কিছুই নাই। উহাতে আত্মা স্বতন্ত্র বলিয়া উপলব্ধি হয় না, কেবল প্রকৃতির প্রতিবিম্ব—পরিবর্ত্তনশীল ছায়ামাত্র বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতিতে যেমন-যেমন পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইতেছে, আত্মাও উপস্থিতমত তাহারই ক্ষণস্থায়ী আকার ধারণ করিতেছে। কখনও মেঘরূপে নীল আকাশে ভাসমান, কখনও সূর্য্যরূপে দিগন্তে সমুদিত। এই

আত্মাতে কোন আবেগ স্থায়ীরূপে থাকিতে চায় না, অন্তরে ঘনীভূত হইতে পারে না, পরিপুষ্ট হইতে পারে না; তাহার উপর দিয়া দ্রুতভাবে চলিয়া যায় মাত্র। আত্মা আপনাকে বাহিরে প্রক্ষিপ্ত করে; আপনার চঞ্চল ক্ষণস্থায়ী ভাবসমূহ বহির্জগতে আরোপ করে। যদি আনন্দ হইল, তবে সে আনন্দ অগ্নির—যিনি দ্রাক্ষালতার মধ্যে দীপ্তি পাইতেছেন; যদি লজ্জা ভয়ের উদ্রেক হইল, তবে সে লজ্জা ভয় তরুণ উষার; লজ্জারক্তিম-কপোল বালিকার ন্যায় উষা যেন মেঘের অন্তরালে লুকাইতেছে। অর্থাৎ একটি অখণ্ড পদার্থের মধ্যে কেন্দ্রীভূত না হইয়া, যে 'আমি' ইচ্ছা করিতেছে, কাজ করিতেছে, সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে সেই আমির মধ্যে বদ্ধ না থাকিয়া বৈদিক কবি আপনাকে বিশ্বময় ছড়াইয়াছেন। তিনি সমস্ত পদার্থে পরিব্যাপ্ত; প্রকৃতির আকার, প্রকৃতির শব্দ, প্রকৃতির বর্ণ এই সমস্তের স্থান তাঁহার আত্মা অধিকার করিতেছে এবং প্রকৃতিও তাঁহার চিন্তায়, তাঁহার কল্পনায়, সজীব হইয়া উঠিতেছে।

"বৈদিক কবি প্রকৃতির জীবন্ত ও দেবোপম শক্তিগুলির পূজা করেন বটে, কিন্তু তাঁহার এই অদ্বৈতধর্ম্ম একটু বিশেষ ধরণের। ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, সূর্য্য এই সকল দেবাত্মা বটে, কিন্তু ইহাদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য তেমন সুস্পষ্ট নহে—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে আকার-বিনিময় ও পরিবর্ত্তন চলিতেছে। এই উষাই সূর্য্য, এই সূর্য্যই অগ্নি, এই অগ্নিই বিদ্যুৎ, এই বিদ্যুৎই ঝটিকা এবং এই ঝটিকাই বৃষ্টি; সকলই পরস্পরের মধ্যে যুক্ত, মিশ্রিত এবং ওতপ্রোত। ইহার মধ্যে কিছুই স্থায়ী নহে। মনুষ্যের মধ্যেও স্থায়ী ব্যক্তিত্বের ভাব নাই—বাহ্যজগতেও কেবলি পরিবর্ত্তন। এই ভাবটি বেদেতে যাহা বীজরূপে অবস্থিত, তাহা ব্রাহ্মণদিগের

পুরাতন দার্শনিক কাব্যসমূহে বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যায়, যে আমিত্বের ভাব য়ুরোপীয়দিগের চিন্তা ও ধারণার মধ্যে বদ্ধমূল, সেই আমিত্ব উহাতে নাই। মনের এই অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, আমাদের জীবনের কোন বিশেষ মুহূর্ত্তকে স্মরণ করিয়া দেখিতে হয়। কথন কথন আমাদের জীবনে একপ্রকার স্বপ্নবৎ অবস্থা হয়, তথন যেন আমাদের আমিত্বটা শিথিল হইয়া আসে, তথন আপনার নাম উচ্চারণ করিলেও যেন কোন ব্যক্তির ভাব মনে আইসে না, যেন অর্থহীন শব্দমাত্র বলিয়া উপলব্ধি হয়; তথন কষ্টের সহিত আমরা প্রশ্ন করি, 'আমি কি আছি?' এই 'আমি'র অর্থ কি? এই অদ্ভুত অনুভব যাহা আমাদের মধ্যে ক্ষণিক তাহা হিন্দুদিগের অন্তরে স্থায়ীভাবে অবস্থিত। তাহারা আত্মাকে এইভাবে দেখে, যেন উহা একটি ক্ষেত্র—যাহার উপর দিয়া বিবিধ স্বপ্ন ক্রমাগত গতিবিধি করিতেছে; অন্তরের মধ্যে এমন কিছুই দেখিতে পায় না যাহা স্থায়ী। 'চলৎ চিত্তং চলৎ বিত্তং চলৎ জীবন-যৌবনং।' এই বিশ্বের অনিত্যবাদ হিন্দুদিগের মধ্যে শাস্ত্রাকারে পরিণত হইয়াছে। আমাদের দেহ অন্ন হইতে অর্থাৎ পৃথিবী হইতে উৎপন্ন; বহির্জগত হইতে পঞ্চভূত আহরণ করিয়া আনি-তেছে, আবার উহা ত্যাগ করিতেছে, আবার নূতন উপকরণ গ্রহণ করিতেছে; এই প্রকারে দেহ বর্দ্ধিত হইয়া জীবিত রহিয়াছে; আমাদের জীবন কতকগুলি পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই নহে। ক্ষিতি, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, পশুপক্ষী, বৃক্ষ, উদ্ভিজ্জ, চিন্তা, মন, চতুর্ব্বেদ সকলই এই বিশ্বব্যাপী চঞ্চল ক্ষণস্থায়ী আবর্ত্তের অন্তর্ভূত। সূর্য্য সমুদ্র জীবজন্তু উদ্ভিজ্জ হইতে যে বাষ্পরাশি নিঃশ্বসিত হইতেছে এবং যাহা সূর্য্য,, জীবজন্তু ও উদ্ভিজ্জ-দেহের অংশীভূত

হইয়া ছিল, সেই বাষ্পরাশি উত্থিত হইয়া সম্মিলিত হইতেছে, দীপ্তি পাইতেছে, আকাশময় ধাবিত হইতেছে, শীতল হইয়া পুনর্ব্বার ধরাতলে পতিত হইতেছে, আবার অবস্থাবিশেষে, সূর্য্য, সমুদ্র, জীবজন্তু, বৃক্ষলতার আকার ধারণ করিতেছে। এই প্রকারে যাহা আমরা স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহা অনবরত পরস্পরের মধ্যে মিশ্রিত হইতেছে, এবং পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইতেছে। যজ্ঞের হোতা যিনি, তিনি বায়ু হইয়া ধূম হইয়া যাইতেছেন। ধূম হইয়া গিয়া বাষ্প হইয়া যাইতেছেন; বাষ্প হইয়া গিয়া মেঘ হইয়া যাইতেছেন, এবং মেঘ হইয়া অবশেষে বৃষ্টিরূপে পতিত হইতেছেন, পরে আবার প্রাণরূপে শস্যাকারে, উদ্ভিজ্জাকারে, বৃক্ষাকারে, সর্ষপাকারে পরিণত হইতেছেন।'

"উপরে যেরূপ বর্ণিত হইল, তাহার সহিত অদ্বৈতবাদের অতি অল্পই প্রভেদ; এবং দুইটি পথ দিয়া এই অদ্বৈতবাদে উপনীত হওয়া যায়। যেহেতু, সর্ব্বপ্রকার আকৃতি একবার যাইতেছে আবার আসিতেছে, সুতরাং উহারা মায়াময়; উহাদের গুণ, উৎপত্তির পদ্ধতি, উহাদিগের হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া লও, তাহা হইলে অবশিষ্ট কি থাকে? কিছুই থাকে না, বৌদ্ধেরা বলে নাস্তি অবশিষ্ট থাকে; জগতের কোন অস্তিত্ব নাই—নাস্তিত্ব ভিন্ন আর কিছুই নাই। ব্রাহ্মণেরা বলেন, 'যাহা আছে তাহাই আছে—তৎসৎ— তাহা ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেই তৎসৎ সর্ব্বগুণ-বিরহিত। যাহা "নেতি নেতি," যাহা কারণও নহে, কার্য্যও নহে, এক কথায় তাহাই ব্রহ্ম; এই ব্রহ্ম ক্লীবলিঙ্গ শব্দবাচক, অনির্দ্দেশ্য ও বিকার-শূন্য। ইনি চিন্তা করেন না, ইচ্ছা করেন না, দর্শন করেন না, জানেন না, ইনি শুদ্ধ ও নির্গুণস্বরূপ। বিশুদ্ধ চিন্তার দ্বারা এই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই ক্লীবলিঙ্গ ব্রহ্মের উপরিভাগে পুংলিঙ্গ

ব্রহ্ম অবস্থিত। এই ব্রহ্ম জীবন্ত, স্পৃশ্য ও সবর্ণ। ইহার অর্থ এই :—এই চঞ্চল ক্ষণস্থায়ী আবর্ত্তের অন্তস্তলে যেরূপ একমাত্র স্থায়ী পদার্থ প্রচ্ছন্ন আছে, সেইরূপ এই আবর্ত্ত সংগঠন ও সংরক্ষণের জন্যও একটি শক্তি থাকা চাই। যেহেতু জগতে কেবলি গতি, সুতরাং এমন একটি শক্তি থাকা চাই যে এই গতিকে নিয়মিত করিতে পারে। যেহেতু, এই জগৎ প্রস্তরের ন্যায় অচল নহে, পরন্তু বৃক্ষের ন্যায় প্রাণ-বিশিষ্ট, সুতরাং ইহা সংরক্ষণ ও পরিপোষণের জন্য একটি আত্মার আবশ্যক। এই আত্মাই ব্রহ্ম, ইনি বিশ্বের বীজস্বরূপ, ইনি 'জীবন্ত অশরীরী আত্মা'। ইনি জীবন্ত, সুতরাং সগুণ, ইনি নির্গুণ ব্রহ্মের প্রথম-আবির্ভাব—প্রথম বিকাশমাত্র। নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম এক নহে। ব্রহ্মা ব্রহ্ম বটে, কিন্তু মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন, কালের অধীন। 'ব্রহ্মের দুই রূপ ; এক, যিনি কালকে জানেন ; আর এক, যিনি কালকে জানেন না। যিনি কালকে জানেন তাঁহার অংশ আছে। এক মহান্ জীবন্ত আত্মার অভ্যন্তরে কালই সকল জীবকে বর্দ্ধিত করিতেছে ও বিনষ্ট করিতেছে, কিন্তু যিনি জানেন, স্বয়ং কাল কাহার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়, তিনিই বেদজ্ঞ।'

"কল্পনা করা যাউক, এক পূর্ণ সত্তা, বিশুদ্ধ ও নির্গুণ সকলের আদিতে ও সকলের মূলে বর্ত্তমান ; 'তিনি সকল আকার ও সকল বীজের আধার।' বাহিরে আপনাকে প্রকাশ করিয়া, তিনি মায়ার অধীন হইয়াছেন ; 'নিজ দেহের উপকরণ হইতে ঊর্ণবায় যেরূপ তন্তু আহরণ করিয়া আপনাকে আচ্ছাদন করে, সেইরূপ তিনি নিজস্বরূপনিঃসৃত গুণের দ্বারা আপনি আচ্ছন্ন হইয়া আছেন' ; তাঁহার প্রথম নিসর্গ সগুণ জীবন্ত ব্রহ্ম, সেই সূক্ষ্ম সার্ব্বভৌমিক আত্মা 'যিনি জগতের মধ্যে থাকিয়া, জগতের বিচিত্রতা

সম্পাদন করিতেছেন, সেই আত্মা পুরুষও নহে, স্ত্রীও নহে এবং ক্লীবও নহে।' সেই আত্মা যিনি কোটি কোটি আকার ধারণ করিতেছেন, যাঁহা হইতে সকল পদার্থ নিঃসৃত হইয়া আবার তাঁহাতেই গমন করে, যিনি নিজে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় অস্থায়ী, যিনি কোটি কোটি যুগের পর—যাহা তাঁহার এক দিন—'অচ্ছায়, অদেহ, অবর্ণ' নির্গুণ পরব্রহ্মে পুনর্ব্বার লয় প্রাপ্ত হন। এই জগৎ এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের ন্যায় শাখাপল্লব বিস্তার করিয়া আছে; ইহার মূলে যে বীজ ছিল, তাহাই সমস্ত বৃক্ষে সঞ্চালিত হইয়া, তমসাবৃত মূল হইতে সুকোমল পুষ্প পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশে প্রাণ সঞ্চার করিতেছে। বৃক্ষের ত্বক্, পুষ্প, পল্লব, কোষাণু, সমস্ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, মরিয়া যাইতেছে, আবার নূতন হইয়া জন্মিতেছে। যে মূল-শক্তি বৃক্ষকে উৎপাদন করিয়াছিল, যাহা বৃক্ষবিশেষের জন্মমৃত্যুর মধ্যে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান, সেই শক্তিই ক্ষণস্থায়ী ভৌতিক উপকরণ-সকলকে বিশেষ বিশেষ আকার ও শৃঙ্খলা প্রদান করিতেছে। জগতের প্রাণ, জীবন্ত ব্রহ্মরূপ যে এই শক্তি, ইহা কোথা হইতে নিঃসৃত হইতেছে?—ভূমি হইতে। ভূমিই আদিম ব্রহ্মের প্রতিরূপ। তাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইতেছে, তাহাতেই সমস্ত প্রতিগমন করিতেছে; যুগযুগান্তের পর যখন এই শক্তি-যাহা বৃক্ষকে পোষণ করিতেছিল—ক্ষয় হইবে, তখনই পরিবর্ত্তনের শেষ হইবে, বৃদ্ধির অবসান হইবে, বৃক্ষ পৃথিবীতে প্রতিগমন করিবে এবং সমস্তই নিশ্চেষ্টতার মধ্যে মগ্ন হইবে। 'আপাততঃ, তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি শিশু, তুমি যুবতী, তুমি যষ্টি-ধারী বৃদ্ধ, তুমি নীল ভ্রমর, তুমি হরিৎপক্ষ ও লোহিত-নেত্র শুকপক্ষী, তুমি বজ্র, তুমি ষড়ঋতু, তুমি সমুদ্র। তুমি অনাদি, কেন না, তুমি অনন্ত, তোমা হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড

উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু যেমন এই প্রবহমান নদীসকল সমুদ্রে গিয়া বিলীন হইয়া যায়, তাহাদের নাম ও আকার বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ, সূর্য্য, চন্দ্র, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মক্ষিকা, ভ্রমর, পক্ষী, দেবগণ, বিষ্ণু, শিব এবং স্বয়ং কাল—যাহাতে দ্বিতীয় ব্রহ্ম বাস করেন—এই সমস্ত সেই অচিন্ত্য পুরুষে বিলীন হইয়া যাইবে, তাহাদের নাম ও আকার কিছুই থাকিবে না'। এখনও দৃশ্যমান জগতে যাহা দেখা যায় তাহা কিছুই বাস্তব নহে, তাহা আবির্ভাবমাত্র। ব্রহ্ম কাল-দর্পণে, মায়া-দর্পণে আপনাকে বহুধা ও বিচিত্র ভাবে দেখিতেছেন; কিন্তু বস্তুতঃ, যাহা আছে তাহাই আছে, তৎসৎ ভিন্ন আর কিছুই নাই।

"এই অদ্বৈতবাদ, কল্পনার খেলা মাত্র নহে, সম্প্রদায়-বিশেষের মত মাত্র নহে, পরন্তু ইহা একটি গভীর বিশ্বাস যাহা ব্যবহারে পরিণত হইয়াছে, যাহা বিজন চিন্তার ও একাগ্র ধ্যানের সুপরিণত ফল। একমাত্র আপনাতে বদ্ধ হইয়া, স্বপ্নমধ্যে মগ্ন থাকিয়া, ব্রাহ্মণ বাস্তব ও স্বপ্নের মধ্যে আর প্রভেদ দেখিতে পান না, জগৎকে বাষ্পবৎ মনে করেন। জগতের সহিত তাঁহার যে বন্ধন ছিল, সে বন্ধন আর অনুভব করেন না। যাহাকে তিনি অবাস্তব বলিয়া জানিতেছেন তাহাকে কি করিয়া ভালবাসিবেন? যাহা আমাদের হাতের মধ্য দিয়া গলিয়া যাইতেছে, তাহাকে কেমন করিয়া ধরিয়া রাখিবেন?

'হে মুনিপুঙ্গব! এই জঘন্য ক্ষণভঙ্গুর, রক্ত-মাংস-অশ্রু-মূত্র-পুরীষময় দেহ ধারণ করিয়া কিরূপে সুখের আশা করিব? লোভ দ্বেষ, মোহ মাৎসর্য্য, অসূয়া, বিচ্ছেদ, ভয়, দুঃখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, জরামৃত্যু, রোগশোকদ্বারা যে দেহ আক্রান্ত সে দেহ লইয়া কিরূপে সুখের আশা করিব? আমরা দেখিতেছি সকলই নশ্বর।

যাহারা আর নাই তাহাদের দিকে ফিরিয়া দেখ, যাহারা এখনও হয় নাই তাহাদের দিকে একবার চাহিয়া দেখ। শস্যের ন্যায় মনুষ্য পরিপক্ক হইতেছে, শস্যের ন্যায় ভূলুণ্ঠিত হইতেছে, আবার মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উত্থান করিতেছে'……হৃদয় হইতে বাসনা নির্ম্মূল করিয়া বনে গমন করিয়া বৃহদ্রথ এইরূপ বিশ্বাস করিয়াছিলেন। ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, সূর্য্যের দিকে নেত্র স্থির রাখিয়া তিনি সহস্র বৎসর বিজন অরণ্যে শান্ত সমাহিত হইয়া বাস করিয়াছিলেন। কারণ, শান্তচিত্ততা, নিশ্চেষ্টতাই সকল হিন্দুশাস্ত্রের ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত। সকলই মায়াময় এই সিদ্ধান্তে যদি একবার উপনীত হওয়া যায়, তবে সেই মায়াজাল হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার চেষ্টাও স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। যদি এই মায়াময় জগতের ক্ষণস্থায়ী বাসনা, অনুভব, ইচ্ছা প্রভৃতিকে নির্ম্মূল করা যায় তবেই মুক্তিলাভ হইতে পারে, নচেৎ মুক্তিলাভের আশা নাই। এইরূপ কল্পনা-জড়িত চিন্তাপ্রভাবে হিন্দুর অন্তর একেবারে শূন্য হইয়া পড়িল; কাজ করিবার আর কোন উদ্দেশ্য রহিল না—যখন নিজেরই অস্তিত্ব নাই, তখন কাজ করিয়া কি ফল? সুতরাং আসন-বদ্ধ হইয়া হিন্দু ধ্যানে মগ্ন হইল, স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। কাহার স্বপ্ন? কাহার ধ্যান?—ব্রহ্মের ধ্যান। ব্রহ্মের ধ্যানই মুক্তি। আমিই ব্রহ্ম—ব্রহ্ম মায়ায় বদ্ধ হইয়াই আপনাকে বহুধা করিয়া দেখেন—এই মায়া-দর্পণ হইতে বিমুখ হইলেই, ব্রহ্ম স্ব-স্বরূপে ফিরিয়া আইসেন, তখন ব্রহ্মের সহিত আমিও যুক্ত হই। অতএব 'সোঽহং ব্রহ্ম' এই মন্ত্র উচ্চারণ কর। 'কারণ, যিনি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, তিনি ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান'। এস আমরা, এই কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন আবির্ভাবসমূহের মধ্য হইতে, সেই 'তৎসৎ'কে জানিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে

তৎক্ষণাৎ আমাদের সীমাবদ্ধ জীবনের সকল প্রতিবন্ধক দূর হইবে, আমরা পুনর্ব্বার অনাদি অনন্তস্বরূপে পরিণত হইব—যেখান হইতে আমরা আসিয়াছিলাম, সেইখানেই আবার ফিরিয়া যাইব। এবড় অদ্ভুত ব্যাপার, কুত্রাপি এ কথা শুনা যায় না যে, কর্ম্মে মুক্তি নাই, বিশ্বাসে মুক্তি নাই, ভাবে মুক্তি নাই, ক্রিয়াকলাপে মুক্তি নাই, পরন্তু জ্ঞানেই মুক্তি। 'যাহাদিগের চরিত্র বিশুদ্ধ, যাহারা বেদ পাঠ করে, যজ্ঞানুষ্ঠান করে, মৃত্যুর পরে তাহারা দেব-লোক গমন করে, কিন্তু তাহাদিগের সঞ্চিত পুণ্য শেষ হইয়া আসিলে, তাহারা আবার ইহলোকে ফিরিয়া আইসে, কারণ, তাহারা সত্যকে জানে না। তাহারা নূতন আকারে জন্মগ্রহণ করে, আবার কামনা করে, ইচ্ছা করে, কর্ম্ম করে, অনুভব করে, জীবন ধারণ করে। .... যে ব্যক্তি ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে প্রভেদ দেখে, সে পরিবর্ত্তন হইতে পরিবর্ত্তনে, মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে উপনীত হয়।' অর্থাৎ তাহাদিগের পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়। চিরশান্তি লাভ করিতে চাও ত নিঃশ্বাসকে রুদ্ধ কর, চিত্তকে একাগ্র কর, ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ কর—বাক্যকে স্তম্ভিত কর। তালুদেশে জিহ্বাগ্র চাপিয়া রাখ, ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ কর, আকাশে কোন বিন্দুর উপর লক্ষ্য স্থির কর; তাহা হইলে চিন্তা রহিত হইবে, চেতনা বিলুপ্ত হইবে, আমিত্ব ঘুচিয়া যাইবে। 'সুখদুঃখ আর অনুভব হইবে না, পরে প্রশান্তি ও কৈবল্যে উপনীত হইবে।' আত্মা যখন পরমাত্মাকে চিনিতে পারিবে তখন আর তাহার আকাশ থাকিবে না, কাল থাকিবে না, সংখ্যা থাকিবে না, সীমা থাকিবে না, গুণ থাকিবে না। 'লূতাতন্তু যেরূপ আপনার তন্তু অবলম্বন করিয়া মুক্ত আকাশে উত্থিত হয়, সেইরূপ যেব্যক্তি ওঁকার অবলম্বন করিয়া ধ্যান করে সে মুক্তিলাভ

করে।' 'যিনি মনহীন, অথচ মনের অভ্যন্তরে অবস্থিত, যিনি প্রচ্ছন্ন অথচ সকলের মূলে বিরাজমান, তাঁহাতে চিত্ত নিমগ্ন কর, আত্মার সকল গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যাইবে।' মন ও ইচ্ছা ধ্বংস হই-লেই মায়ার সমস্ত ইন্দ্রজাল তিরোহিত হয়। 'তখন আমরা ধূম-হীন অগ্নির ন্যায় প্রতীয়মান হইব, রথকে পরিত্যাগ করিয়া আরোহী যেরূপ রথের চক্রঘূর্ণন নিরীক্ষণ করে, আমরা তখন সেইরূপ হইব'—'দুঃখ আমাদের অন্তরে আর থাকিতে চাহিবে না; যেব্যক্তি ব্রহ্মকে জানে, সে চিরশান্তি প্রাপ্ত হয়।' যখন আমরা জানিলাম, আমরা সেই পূর্ণ জ্যোতিঃস্বরূপের স্ফুলিঙ্গ, তখন আর কে আমাদিগকে দুঃখ দিতে পারে? তখন আর এ কথা বলি না, 'এই শরীরই আমি, কিম্বা আমি অমুক,' কিন্তু বলি, 'আমিই ব্রহ্ম, আমিই জগৎ।' তখন আর আমরা 'গুণ-তরঙ্গে' নীয়মান বা বিচলিত হই না। ......

"অতি সূক্ষ্ম আলোচনার প্রভাবে ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক দার্শনিক ঘূর্ণিরোগে আক্রান্ত; চিন্তার দ্বারা চিন্তার উচ্ছেদ—ইচ্ছার ধ্বংস সাধন, ইহা ত ব্রাহ্মণ্য দর্শনের প্রত্যক্ষ ফল। এই মায়াবাদের-প্রবণতা সেই আদিম বৈদিক যুগে আরম্ভ হইয়া তাহার ফল এতদূর পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে। এই পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। অন্যত্রও ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। একটি সমস্ত জাতি মায়াবাদে দীক্ষিত—ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও এরূপ দেখা যায় না বটে, কিন্তু য়ুরোপেও এরূপ ব্যক্তিবিশেষ মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা হিন্দু-ভাবে অনুপ্রাণিত। ফ্রান্সে, আমাদের একজন বড় কবি, জাঁ লাহর, তিনি অজ্ঞাতসারে হিন্দু; তাঁহার 'মায়া' ও 'নাস্তি' বিষয়ক গ্রন্থে হিন্দু-শাস্ত্রের ভাব জীবন্ত ভাবে লক্ষিত হয়। ইংলণ্ড, যেখানকার লোকেরা এমন সাহসী, এমন উদ্যমশীল, যেখানে আমিত্ব-ভাব এমন স্থায়ী ও বলবৎ, যেখানকার ধর্ম্ম হিব্রুধরণের একেশ্বরবাদ, সেখানেও

হিন্দুপ্রাণ 'শেলি' উদিত হইয়াছেন। সমালোচকেরা স্পষ্টই দেখাইয়াছেন, শেলির অনেকটা বৈদিক ধরণের কল্পনা ছিল। ... ... তিনিও বৈদিক কবির ন্যায়, আপনাকে বহির্জগতে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন; তাঁহার কবিতা,—সচল প্রকৃতির সচল প্রতিবিম্ব; যাহাতে ব্যক্তিত্বের অধিষ্ঠান উপলব্ধি হয় এরূপ হৃদয়-ভাব শেলির কবিতাতে বিরল; 'আমি' বলিয়া যে একটী অনুভূতি তাহা তাঁহার কবিতাতে অতি অল্পমাত্রায় লক্ষিত হয়। সকল সময়েই, তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস,—বহিঃপ্রকৃতির হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। তাঁহার আত্মা প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র নহে, পরন্তু প্রকৃতিতে ছড়াইয়া আছে। সুতরাং প্রকৃতির সকল পদার্থই তাঁহার নিকট প্রাণবিশিষ্ট, জীবন্ত, বোধবান, গতিশীল ও বিচিত্র-রূপধারী। জগতের মূলে তিনি এমন এক আত্মা দেখিতে পান, আমরা যাহার চিন্তাস্বরূপ; যে আত্মা কীটের মধ্যে স্পন্দিত হইতেছে, ও তারকার মধ্যে দীপ্তি পাইতেছে; এমন একটি আত্মা—প্রকৃতি যাহার রহস্যময় পরিচ্ছদ; যাহা সমস্ত দৃশ্যমান পদার্থের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান, এবং যাহাকে কখন কখন, কোনও বিরল মুহূর্ত্তে, স্বচ্ছ আবরণ-মধ্যবর্ত্তী ম্লান দীপশিখার ন্যায় সুন্দর আকৃতির ভিতর দিয়া আমরা দেখিতে পাই। 'শৃঙ্খলামুক্ত প্রমথ' নামক তাঁহার কবিতাটি পাঠ করিয়া দেখ—যেখানে সমস্ত আত্মা, সমস্ত জীব, একতানে সম্মিলিত হইয়াছে, বিশেষতঃ যেখানে পৃথিবীর সহিত চন্দ্রের কথাবার্ত্তা চলিতেছে—সেই অংশটি পাঠ করিয়া, যে প্রাণ সকল পদার্থের মধ্য দিয়া প্রবাহিত—সেই বিশ্ব-প্রাণের অনন্ত উচ্ছ্বাসে কে না উন্মত্ত হইয়া উঠিবে? বিচিত্র শব্দ, বিচিত্র গন্ধ, বিচিত্র বর্ণ যাহা আমরা বাহিরে দেখি—সমস্তই ব্রহ্মের মায়া; এই মায়ামোহে কে না আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে? কিন্তু শেলি ইহার অধিক যান নাই; শান্ত, নির্গুণ ব্রহ্মকে তিনি দেখিতে পান নাই।

হিন্দু-বুদ্ধি ও হিন্দু কল্পনা—এই দুই ধাপের মধ্যে একটি ধাপে তিনি পৌঁছিয়াছেন মাত্র। সেটি কল্পনার ধাপ। তিনি বৈদিক কবির স্বপ্নোচ্ছ্বাস, আনন্দোচ্ছ্বাস পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছেন; কিন্তু হিন্দু দার্শনিকের লয়তত্ত্বে পৌঁছেন নাই। তাঁহার অদ্বৈতবাদে বিশ্ব-প্রাণের উচ্ছ্বাস আছে, নির্ব্বাণ নাই। তাঁহার অদ্বৈতবাদ সুস্থ ও সবল।

"'আমিয়েল' আর একটি অপেক্ষাকৃত পূর্ণাবয়ব দৃষ্টান্ত। ইনি সগুণ জীবন্ত ব্রহ্মকে ভেদ করিয়া আরও একটু ভিতরে তলাইয়াছেন। ইনি ব্রহ্মের শান্তস্বরূপে প্রবেশ করিয়া নিস্পন্দ অসাড় হইয়া পড়িয়াছেন; মুক্ত হইয়াছেন। ... ... হিন্দুর নিশ্চেষ্টতা, হিন্দুর বৈরাগ্য, হিন্দুর মায়াবাদ, ইচ্ছা ভাব ও বুদ্ধির এই যে তিন ধাপ, ইনি এই তিন ধাপই মাড়াইয়া আসিয়াছেন। ইনি আপনাকে ব্রাহ্মণদিগের ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করেন। 'ভারতবর্ষীয় যোগীর ন্যায় আমার আত্মা মায়ার দোলায় আন্দোলিত; আমার নিকট সকলই, এমন কি, আমার নিজের জীবন পর্য্যন্ত, ধূম, বিভ্রম, ও বাষ্পবৎ। এই সকল বিষয়রাশি আলোকের ন্যায় আমার উপর দিয়া চলিয়া যায়, কোন পদচিহ্ন রাখিয়া যায় না—তাহার উপর আমার অল্পই আস্থা। চিন্তা অহিফেনের স্থান অধিকার করিয়াছে; চিন্তা সকলকে উন্মত্ত করিতে পারে, সকল পদার্থকে, এমন কি পর্ব্বতকেও অন্তর্ভেদী স্বচ্ছতা প্রদান করিতে পারে।' ... ... 'প্রত্যেক সভ্যতা, যুগযুগান্তের স্বপ্নস্বরূপ; ইহাতে আকাশ, পৃথিবী, প্রকৃতি ইতিহাস একপ্রকার অদ্ভুত বিচিত্র আলোকে প্রকাশ পায় এবং বিভ্রম-অভিভূত আত্মার প্রলাপ-নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে।' ... ... 'উপছায়াকে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, ধরিতে পারা যায় না, আমি সেইরূপ উপছায়ার ন্যায় তরল পদার্থ। ... ... না মরিয়াও আমি প্রেতের ন্যায়। অন্য সকলে আমার নিকট স্বপ্নের

ন্যায়, আমিও অন্যের নিকট স্বপ্নবৎ।’ এই সেই অদ্ভুত অনুভূতি যাহা বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিয়া, শুধু ব্রাহ্মণ্য-দর্শন কেন, ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতাতেও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ প্রকটিত করিয়াছে। আমিয়েলের ‘আত্ম-প্রকাশ’ গ্রন্থে, ব্যবহারিক জীবনের একটি কথাও নাই। যেব্যক্তি বিশ্ব-আত্মাকে চিন্তা করে, পূর্ণস্বরূপে মনোনিবেশ করে আগন্তুক ক্ষুদ্র বিষয়-সকল কেমন করিয়া তাহার ভাল লাগিবে? যদি জগৎ মায়াই হইল তবে এরূপ জগতে ভাল স্থান অনুসন্ধান করিবার আবশ্যকতা কি? যদি দৃশ্যমান বাস্তব জগতে আমার কোন আস্থা না থাকে, দৃশ্যমান বাস্তব জগৎও আমাকে আর স্থান দেয় না। ভারতবর্ষে ত ইহার ফল প্রত্যক্ষ দেখা যায়। দর্শন ও জ্যোতিষশাস্ত্র ব্যতীত হিন্দুদিগের আর কোন বিজ্ঞান নাই। প্রকৃতির নিয়ম ও তথ্য অনুসন্ধানে গ্রীকদিগের ন্যায় হিন্দুদিগের কোন কৌতূহল ছিল না; কতকগুলি উপনিষদ্ মনে হয়, বাতুলের লেখা, বালকের লেখা। তাহাতে কুকুরেরা ও পক্ষীরা তর্কবিতর্ক করিতেছে, দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছে, তাহাতে ইতিহাসের কথা আদৌ নাই। এই বৃহদায়তন সাহিত্য কেবল স্বপ্ন ও দর্শনের জটিলতায় পূর্ণ। কোন একটি ঘটনার তারিখ, কোন গম্ভীর বিষয়ের উপাখ্যান বা কোন বংশাবলীর কথা ইহাতে কিছুই নাই। আসিয়ার বড় বড় ধর্ম্মমূলক ঘটনার বিষয় যাহা কিছু জানা যায় তাহা প্রায়ই চীন পরিব্রাজকদিগের নিকট হইতে। বৌদ্ধধর্ম্ম কখন্ ভারতে আরম্ভ হইল, কখনই বা ভারত হইতে অন্তর্হিত হইল কিছুই জানিতে পারা যায় না। সত্যই যদি সমাজ ও সমাজের সভ্যতা—(যেমন আমিয়েল বলেন, আত্মার মূর্তিমান স্বপ্নমাত্র,) ব্রহ্মসাগরে উৎক্ষিপ্ত ক্ষণস্থায়ী তরঙ্গমাত্র, তবে এমন বাতুল কে আছে যে, সভ্যতার ইতিহাস, সমাজের ইতিহাস লইয়া মস্তিষ্ক আলোড়ন করিবে?

"… … ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম যদি একবার প্রতিষ্ঠিত হইল, দার্শনিক স্বপ্নের একবার যদি আরম্ভ হইল, তাহা হইলে বহিঃশত্রুর আক্রমণ আর কিরূপে প্রতিরুদ্ধ হইবে? প্রাচীন ভারতের নাগরিক ব্যবস্থা-বন্ধন, সামরিক ব্যবস্থা-বন্ধন, রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা-বন্ধন সকলই অসম্পূর্ণ, কিছুরই নির্দ্দিষ্ট আকার নাই, সমস্ত হিন্দুজাতি "জেলির" ন্যায় থল্‌থলে, অস্পষ্ট, অসম্বদ্ধ, দুর্ব্বল; কাজেই মুসলমান ইংরাজ যে কেহ প্রথম আসিয়া আক্রমণ করিল, সেই অনায়াসে জয়লাভ করিল। হিন্দুর তাহাতে কি আসে যায়? যাহা প্রকৃত সত্য, যাহার ধ্যানে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহারই স্বপ্নে মগ্ন হইতে দাও, তাহা ধ্যান করিতে দাও, শান্তিদায়ী ওঁকারের আবৃত্তি করিতে করিতে সেই পরমাত্মার ধ্যানে মত্ত হইতে দাও, তাহা হইলেই হইল, হিন্দু আর কিছুই চাহে না।"

ভারতবর্ষে—জয়পুর।

"কলিকাতায় ইংরাজী ভারতবর্ষ; কাশীতে ব্রাহ্মণের ভারতবর্ষ; আগ্রায় মোগলের ভারতবর্ষ; এখানে রাজাদের ভারতবর্ষ, উপন্যাসের ভারতবর্ষ, গীতি-নাট্যের ভারতবর্ষ। … … … এই রাজপুতানাকে কেহই জয় করিতে পারে নাই। কত বিভিন্ন জাতি ভারতবর্ষের প্রভু হইল, কিন্তু সকলেরই বিরুদ্ধে রাজপুতেরা আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। রামায়ণের পৌরাণিক যুগে ইহারা যে আর্য্যজাতি ছিল, এখনও ইহারা সেই আর্য্যজাতিই আছে। এখানকার রাজার বংশ-সূত্র ১৩৯ পুরুষ ভেদ করিয়া সূর্য্যবংশে সংগ্রথিত—যে সূর্য্যবংশ হইতে মহানুভব

রামচন্দ্রের উৎপত্তি। ইনি এখনও, সেই পুরাতন হিন্দু রাজাদের প্রথা অনুসারে, মনুর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন। রাজার অধীনস্থ ঠাকুরেরাও চন্দ্র সূর্য্য বংশ হইতে প্রসূত—ইঁহাদেরও বংশাবলী কালের অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে। এখানকার সাধারণ লোকেরাও গৌরবর্ণ আর্য্যজাতি হইতে প্রসূত—ইহারা বিভিন্ন শ্রেণীতে ও গোত্রে বিভক্ত। রাজপুতমাত্রই জাতিতে ক্ষত্রিয়। এই যোদ্ধৃজাতি ব্রাহ্মণ-ব্যতীত আর কাহাকেও আপনাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করে না। এই নিমিত্ত, এখানকার একজন কৃষকও আপনাকে রাজার সমকক্ষ বলিয়া মনে করে; "রাজপুত" অর্থাৎ রাজপুত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দেয়। ইহাদের মধ্যে সদর্প পুরুষোচিত আত্ম-মর্য্যাদার ভাব বিদ্যমান; একটি অশ্ব, একটি বল্লম, একটি ঢাল ইহাদের সম্বল; যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইহারা নিজ-নিজ গোত্র-পতির অধীনে যুদ্ধে অগ্রসর হয়; আপনাদের নগর ও দেবতাকে রক্ষা করিবার জন্য পিতৃস্বরূপ রাজার পতাকাতলে আসিয়া সম্মিলিত হয়।

হোটেল হইতে জয়পুরের যাহা কিছু দেখিতে পাই তাহাতে মনে হয় যেন একটি নূতন জগতে আসিয়াছি। সাদা-সাদা ছোট-ছোট দুর্গভূষিত পাহাড় এবং দুর্গের বুরুজ-শ্রেণী দিগন্তে বিস্তৃত। য়ুরোপীয় মধ্যযুগের সরঞ্জাম এই উষ্ণ প্রাচ্যদেশে দেখিব আশা করি নাই। রাস্তায় ছোট-ছোট গাধার পাল, তাহার মধ্যে দলে দলে স্ত্রীলোকেরা গান গাইতে গাইতে চলিয়াছে; সওয়ারেরা উৎকৃষ্ট আরব ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়াছে; কোমর-বন্ধে ঢাল, পার্শ্বে তলবার, মাথায় লাল পাগ্‌ড়ি, ইহাদের বড় বড় দাড়ি বিভক্ত হইয়া দুই পাশে বিস্তৃত—এবং বামে ডাহিনে কাঁটার ন্যায় খাড়া হইয়া উঠিয়াছে; ইহারা খুব আস্ফালন সহকারে চলিয়াছে।

ভারতবর্ষে আসিয়া সাধারণ লোকের মুখে যেরূপ স্ত্রী-সুলভ কোমলতা, আলস্য ও স্বপ্নময় ভাব সচরাচর দেখা যায়, ইহাদের মুখে সেরূপ কোন ভাব নাই। ইহারা খুব কার্য্যতৎপর। পেয়াদা, ঘোড়-সওয়ার, উট, হাতী, বড় বড় প্রকাণ্ড গরুর গাড়ি, এবং ছোট-ছোট গাধায় রাস্তা ভারাক্রান্ত; ধূলা ও রৌদ্রের মধ্য হইতে ইহাদের গোলযোগ শোনা যাইতেছে।

রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে আধ ঘণ্টার মধ্যেই দুর্গবদ্ধ-নগর-প্রাচীরের একটি তোরণের নিকট আসা যায়। সমুচ্চ বুরুজ-শ্রেণীর তল দিয়া একটি দুর্গ-সেতু পার হইতে হয়, তাহার পর একটি ভিতরকার প্রাঙ্গণ, সেই প্রাঙ্গণে উটেরা বোঝা খালাস করিবার জন্য হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছে। এই প্রাঙ্গণ পার হইবামাত্র গীতিনাট্যের দৃশ্য-পটের ন্যায় হঠাৎ একটা অদ্ভুত অপরূপ, কুয়াশাবৎ, বর্ণনাতীত দৃশ্য নেত্রসমক্ষে উপস্থিত হয়।

গোলাপি রঙের দৃশ্য সর্ব্বপ্রথমেই নেত্রসমক্ষে উপস্থিত। এখানে সকলই গোলাপী। পাঠক যেন কল্পনা করেন, এখানকার যে-কোন ছবি তাঁর সম্মুখে ধরিব, সকলই গোলাপী রঙ্গে চিত্রিত। সুপ্রশস্ত রাজপথের দুই ধারে গোলাপী বাড়ি, গোলাপী দেবমন্দির, গোলাপী প্রাসাদ, গোলাপী সৌধ-চূড়া এবং গোলাপী তাম্বু-আকারের গৃহ। এই গোলাপী রং একটু ফিঁকা ও কোমল সুকুমার ধরণের; এই রংটি রাস্তার এক সীমা হইতে আর এক সীমা পর্য্যন্ত বরাবর সিধা চলিয়াছে। গোলাপী বাড়ি, দোকান, সব ঘেঁষাঘেঁষি পাশাপাশি সিধাভাবে চলিয়াছে, ক্রমে সমস্তই যেন অপূর্ব্ব গোলাপী রঙের বাষ্পে মিলাইয়া গিয়াছে। এই রঙ্গীন বাষ্পের মধ্যে একটিও কালো দাগ নাই, একটিও বিলাতী গাড়ি নাই; রাস্তার জনতার মধ্যেও বিচিত্র বর্ণচ্ছটা ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। রাস্তার

দুই ধারের বাঁধানো-পদপথের উপর খোলা বাজার বসিয়াছে, দোকানদারেরা হাঁটু গাড়িয়া সারি সারি বসিয়া আছে এবং সেই পদ-পথের উপর বিছানো লাল নীল রঙের শতরঞ্জির উপর নানা প্রকার চাকচিক্যময় দ্রব্য সাজানো রহিয়াছে। জরির চটি জুতা, রাশীকৃত কলা ও নারিঙ্গি নেবু, রংকরা মূর্ত্তি, রৌদ্রদগ্ধ নানা প্রকারের কাপড়, কি বামে কি ডাহিনে যে দিকে চাই, সকলই চক্‌চক্ করিতেছে, ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। একটি সমস্ত দিন ধরিয়া জয়পুরে ঘুরিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করে—সমস্ত জিনিসের খুঁটিনাটি মনে করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে। এখানে চক্ষুর ক্লান্তি উপস্থিত হইবার সময় নাই। আমি কোচ্‌মানকে এত বলিতেছি "আস্তে আস্তে"—তবু সে গাড়ি শীঘ্র হাঁকাইবে। শেষে কি করি, গাড়ি হইতে নাবিয়া পড়িলাম—এবং আপনার ইচ্ছামত ঢিমাচালে চলিতে লাগিলাম।

রাজপুত ঠাকুরেরা ও কর্ম্মচারীগণ, নাটকের অভিনেতাদিগের ন্যায়, ফুল-কাটা জরির পোষাক-পরিহিত এবং ইহাদের বিপুল গর্ব্বিত শ্মশ্রুরাজি হাত-পাখার আকারে মণ্ডলাকারে বিস্তৃত; মসৃণদেহ সুন্দর অশ্ববৃন্দ—ঢাল-তলোবারধারী ঔপন্যাসিক সৈনিকগণ, বিদ্যালয়ের ছাত্র, প্রাসাদের রক্ষিদল, নগ্নশিশু ক্রোড়ে করিয়া অশ্বারোহী স্ত্রীলোক—এই সমস্ত পাৎলা-কুয়াশাচ্ছন্ন রাস্তা দিয়া সারি সারি চলিয়াছে। দোকানদারেরা তাহাদিগের দোকান হইতে হাত বাড়াইয়া সস্মিত মুখে আমাকে নানাপ্রকার রংকরা পাথরের দেবমূর্ত্তি প্রদর্শন করিতেছে, সকল দেয়ালে নীলরঙে নানাপ্রকার ছবি আঁকা; হাতি, চিতা, গাছ, রেলগাড়ির কল—হাস্যজনক বড় বড় আলথাল্লা কোর্ত্তা-পরা টক্‌টকে লাল আড়ষ্টভাবে-দণ্ডায়মান য়ুরোপীয় মূর্ত্তি চিত্রিত। ৩০ বৎসর বয়সের পূর্ণবয়স্ক

লোকেরা ঘুড়ি উড়াইতেছে ও স্কুলের ছাত্রদিগের ন্যায় ছুটাছুটি করিতেছে। এই সমস্ত শিশুপ্রকৃতি লোকেরা হাসিতেছে খেলিতেছে—ইহাদিগকে দেখিয়া মনে হয় কোন কবি অদ্ভুত-রসপূর্ণ কল্পনার খেয়ালে এমন একটি স্বপ্নজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন যেখানে সকলই লঘুপ্রকৃতি, অদ্ভুত, সুখী, হাওয়ার-ন্যায়-ফুর্‌ফুরে—যেখানে কোন দুঃখ নাই, কোন কুৎসিত বস্তু নাই। এই জগতের লোকেরা জন্তুদিগের সহিত ভ্রাতৃভাবে একত্র বাস করিতেছে, ইহারা আমাদিগের অপেক্ষা ঢের সরল ও খোলা-প্রাণ। এই দেখ ছোট ছোট গাধা ও উটের সারি; উটেরা হেলিয়া-দুলিয়া ধীরগতিতে চলিয়াছে এবং রাস্তার ভীড় ছাড়াইয়া আপনাদিগের উন্নত কণ্ঠ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়াছে; গৃহের ছাদে কটা-কটা বানরেরা বসিয়া আছে; ঐ দেখ কতকগুলি গরু, উহাদের বড় বড় হরিদ্বর্ণ সিং; উহাদের দেহ সমস্ত সাদা—মনে হয় যেন মার্ব্বল পাথরে খুদিয়া-বাহির-করা।

কতকগুলি কুকুর দেখিলাম, তাহাদের গা হল্‌দিয়া, নীল ও লাল রঙে রঞ্জিত। আর একটু দূরে একটা চকের মধ্যে পায়রার ঝাঁক দেখিতে পাইলাম, বৃহৎকায় হস্তীরা যাইবামাত্র তাহারা উড়িয়া অন্যত্র বসিতেছে। এই সকল জীবন্ত পশুপক্ষীর মধ্যে, দেবত্বপ্রাপ্ত বৃক্ষ, হস্তী, বানর প্রভৃতির ক্ষুদ্র মূর্ত্তিসকলও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। একটা বৃহৎ চৌমাথা রাস্তা—এই চৌমাথা দিয়া আর একটা রাস্তা ধরা গেল। এ রাস্তাটাও পূর্ব্বের ন্যায় বৃহৎ, সিধা ও গোলাপী রঙে রঞ্জিত। এখানেও কতকগুলি মন্দির দেখিলাম, হস্তীর প্রস্তরমূর্ত্তিসকল মন্দিরের পাদদেশে প্রতিষ্ঠিত। এই গোলমালের সীমা নাই—পথিকের দল, ফুলের রাশি, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, ঘোড়সওয়ার, দোকানদার প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। পায়রার

ঝাঁক্‌ মাটিতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতেছে, তাহার মধ্যে শত শত নিদ্রালু নির্ব্বোধ গাভী শয়ান—লোকজনের গোলমালে তাহাদের ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। কতকগুলি বালক বাঁশের লম্বা কচি-কচি ডাল লইয়া দণ্ডায়মান—ভক্তেরা সেই সকল ডাল ক্রয় করিয়া গাভীদের পদতলে উপহার দিতেছে; গাভীরা ঋণস্বরূপ উহা গ্রহণ করিয়া প্রশান্তভাবে চর্ব্বণ করিতেছে। বৃক্ষশাখা হইতে শেওলা-পড়া মাটির ভাঁড়সকল ঝুলিতেছে, তাহার উপর ঝাঁকে-ঝাঁকে টিয়া পাখি আসিয়া বসিতেছে—তাহাদের গোল-গোল সুন্দর মাথার চারিধারে লোহিত রেখার ঘের। ...... হঠাৎ ঘোড়ার পদক্ষেপ-শব্দ;—এই গর্ব্বিত অশ্বারোহীবৃন্দ না জানি কারা! অশ্বদিগের মসৃণ গাত্র চিক্‌চিক্‌ করিতেছে—সুন্দর অশ্বারোহীদিগের অস্ত্র সকল চক্‌চক্‌ করিতেছে। ইনি রাজার ভ্রাতা—ইঁহার পশ্চাতে রাজপুত ঠাকুরেরা, পুরোভাগে আসা-সোটাধারী পদাতিকেরা দৌড়িতেছে। ইঁহার মাথায় মখ্‌মলের পাগ্‌ড়ি—গায়ে সবুজরঙের ফুলকাটা চাপকান, নিজ অশ্বকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া নাচাইয়া নাচাইয়া চালাইতেছেন। ক্ষণকালের জন্য ইঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম। ইঁহার উদার সাহসিক মুখশ্রীতে উচ্চকুল, পুরাতন শোণিত, চিরাভ্যস্ত প্রভুত্বের ভাব যেন স্পষ্ট অনুভব করা যায়। ইনি একজন প্রকৃত ক্ষত্রিয়, ভারতবর্ষের আদিম বিজয়ীগণের সাক্ষাৎ বংশধর।

হস্তিবৃন্দ হস্তিশালায় প্রবেশ করিল। ঐ দেখ, সাতটা হস্তী—কৃষ্ণবর্ণ প্রকাণ্ড স্তূপাকৃতি, গম্ভীর "ফিলজফর", ধীরগতি, স্বকীয় দেহ-নিম্নস্থ কোলাহলময় তাবৎ জীবপ্রবাহের উপর কৃপাদৃষ্টি করিতেছে। শুণ্ডদ্বারা মৃত্তিকা ঈষৎ ছুঁইয়া, প্রকাণ্ড মস্তকের উপর মাহুতকে ধারণ করিয়া ইহারা একে একে দ্বারমধ্যে অন্তর্হিত হইল। মানুষের ন্যায় পা নোয়াইয়া, কোমল পদতল ধীরে ধীরে বাহির করিয়া,

ইহারা চলিতে থাকে—ছায়ার ন্যায় একেবারে নিস্তব্ধ। ইহাদের প্রকাণ্ড বিষণ্ণ মস্তকের অভ্যন্তরে না জানি কি গভীর চিন্তা প্রবাহিত হইতেছে, যে সকল নিকৃষ্ট জীবজন্তু ও লোকজন ইহাদের সম্মুখ দিয়া যাইতেছে তাহাদের প্রতি দৃক্‌পাৎ নাই। ইহাদিগকে দেখিলে বুঝা যায়, কেন গজমুণ্ডধারী গণেশ জ্ঞানের দেবতা হইয়াছেন।………

প্রতিমুহূর্ত্তে চিত্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আমি এই চলন্ত ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিতেছি। প্রাসাদের একটা উচ্চ দ্বারের সম্মুখে স্থূলচর্ম্মী জন্তুসকল, উষ্ট্র, লোকজন, বাজপক্ষীর ঝাঁক্। তোরণের উপরে কুলাঙ্গির অভ্যন্তরে একটা লোহিত হস্তিমূর্ত্তি সুষুপ্ত—তাহার সম্মুখে লোকেরা ঘুরিতেছে, চীৎকার করিতেছে। এবং তীক্ষ্ণধ্বনি তূরি ভেরী হইতে হিন্দু-সঙ্গীত উত্থিত হইতেছে।

সেই প্রশস্ত মুক্তস্থানের চতুর্দ্দিকে, মন্দির, স্মরণস্তম্ভ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাসাদশ্রেণী বিরাজিত। ইহাদের মধ্যে একটি অট্টালিকা ঘোর গোলাপীবর্ণ, পিরামিডের ন্যায় সমুত্থিত। ইহার নয় তলা ও শত চূড়া এবং ইহার চৌষট্টি বহিরুদ্গত গবাক্ষদ্বার; বারাণ্ডা, স্তম্ভশ্রেণী, ও প্রস্তর-খোদিত শত শত কৃত্রিম পুষ্পে ইহা বিভূষিত। সমস্ত গঠনপ্রণালী বাষ্পবৎ বায়ুবৎ লঘু, অসাধারণ ও অদ্ভুত। ইহা বায়ু-প্রাসাদ। এই নামটি অতি সুন্দর। এই প্রকার, নগরের চারিধারের ছোট-ছোট পাহাড়ের উপর মেঘ-প্রাসাদ ও সূর্য্যমন্দির সকল দেখিতে পাওয়া যায়। নগরের অপর প্রান্তে যে গোলাপী রঙের দ্বার দেখা যায় তাহার নাম "পান্নাদ্বার।" আমরা যেন প্রাচ্যদেশের পরী-উপাখ্যানের দৃশ্য-মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।

তূরীনিনাদ শোনা যাইতেছে। করতালের এরূপ ঘোরতর রব হইতেছে যে, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিতে হয়। শব-সহযাত্রী উল্লাসপূর্ণ এক দল বাদক দ্রুতপদে চলিয়াছে—সূক্ষ্ম শুভ্র

বস্ত্রে আচ্ছাদিত মৃতদেহকে বাঁশে বাঁধিয়া লোকেরা লইয়া যাইতেছে। পরিবারবর্গ করতাল বাজাইতে বাজাইতে, লাফাইয়া লাফাইয়া চলিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে "রাম রাম" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। শববাহীদল অন্তর্হিত হইল। এক্ষণে দেখিতেছি, শৃঙ্খলবদ্ধ শিকারী কুকুরবৃন্দ—বেগ্নি রঙের পরিচ্ছদে আবৃত। উদ্যানে খাটিয়ার উপর, মহারাজার শিকারী নেকৃড়ে বাঘ, সুনম্য কৃশদেহ অদ্ভুত জীব, দেখিতে উদার-প্রকৃতি, ইহার তীক্ষ্ণ চক্ষে যেন বিদ্যুত খেলিতেছে, রক্ষকেরা মুঠা বাড়াইয়া দিতেছে, আর সে কণ্টকিত জিহ্বার দ্বারা তাহা চাটিতেছে। অন্যত্র, একটা বিবাহ-ব্যাপার। চল্লিশ জন গায়িকা স্ত্রীলোক, জরদ রঙের রেশ্মি কাপড়ে সজ্জিত হইয়া ভূতলে বসিয়া আছে। কন্যার বয়স দশ বৎসর, সে কেবল গায়িকাদিগের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। রাস্তার শেষভাগে পদপথের উপর একটা গরাদের পিছনে, দশটা নরাহারী ব্যাঘ্ররাজ মস্তক নত করিয়া তাহাদের কারাগৃহের মধ্যে ধীরে ধীরে পায়চালি করিতেছে। লোকেরা উহাদিগকে "সাহেব" অর্থাৎ প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতেছে—"সাহেব" নামের উপযুক্ত বটে। উহাদের মধ্যে যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা দেখিতে ভাল, সে ষোলটা স্ত্রীলোককে বধ করিয়াছে। ... ...

এই বিচিত্র দৃশ্যের মধ্যে, একটি দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়—সে দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। ছোট ছোট ছেলেদের নগ্নদেহের কি নমনীয়তা, কি লাবণ্য! যত দেখি ততই ভাল লাগে—দেখিয়া ক্লান্ত হই না। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদিগের সুগোল ট্যাবাটোবা ক্ষীণদেহ দেখিতে অতি চমৎকার। দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ কেশগুচ্ছ তাহাদের সুন্দর বিহ্বল মুখের উপর এবং সুকুমার-গঠন সুন্দর বক্ষের উপর

ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সেই নবীন পেশীরাশি ও শোণিতের বল ও স্বাস্থ্য যেন স্পষ্ট অনুভব করা যায়। সে অতি চমৎকার। তাহাদের শ্যামবর্ণ দেহচর্ম্ম, আলোক ও বিশুদ্ধ বায়ুতে আচ্ছন্ন—তাহাতে আলোক ও ছায়া কেমন সুন্দররূপে মিশিতেছে। যুবতী স্ত্রীলোকদিগের বক্ষের নিম্নদেশ হইতে উদরের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত অনাবৃত—তাহারা যেরূপ পরিচ্ছদ পরে তাহা অতি সুন্দর। তাহাদের পরিহিত কোমল পরিচ্ছদ যেরূপ দেখিতে মধুর, নয়ন-তৃপ্তিকর, সাদাসিধা ও শান্তিময় এমন আর কোথাও নাই। যে সকল বালিকারা অপেক্ষাকৃত কৃশ, তাহাদের আভ্যন্তরিক দেহপঞ্জরের আন্দোলন স্পষ্ট যেন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

একটা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, তাহার প্রকাণ্ড সোপান রাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে। নিম্নদেশে, উষ্ট্রেরা হাঁটু গাড়িয়া ঘুমাইতেছে এবং সোপানের ধাপের উপর কুকুরেরা রৌদ্রে শুইয়া আছে। সোপান দিয়া উঠিয়া একটা প্রাঙ্গণের সম্মুখে আসিলাম, সেই মার্ব্বল-আচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে গাভীবৃন্দ মুক্তভাবে বিচরণ করিতেছে। ইহার এক কোণে দুইটি পবিত্র বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত—একটি পুরুষ-বৃক্ষ বট এবং আর একটি স্ত্রী-বৃক্ষ, তাহার নাম পিপ্পল। একজন বৃদ্ধা প্রথম বৃক্ষটির চারিদিকে দ্রুতভাবে প্রদক্ষিণ করিতেছে, আর একটি বৃদ্ধা দ্বিতীয় বৃক্ষটির পাতায় জল ঢালিতেছে। ইহার ধারে আর একটি দ্বিতীয় প্রাঙ্গণ, ইহা স্তম্ভ-পরিধৃত বারাণ্ডার দ্বারা বেষ্টিত; এইখানে, ছায়াতলে বসিয়া লোহিত বসনাবৃত কতকগুলি স্ত্রীলোক, পুরোহিতের মুখ হইতে নাকী-স্বরে উচ্চারিত রামায়ণ-গান শান্তভাবে শুনিতেছে। ঘোমটার নীচে যে সুন্দর মুখগুলি দেখা যাইতেছে, তাহারা যে খুব ধ্যানে মগ্ন এরূপ বোধ হয় না। এখানে সকলেই এক পরিবারের-মত

অবস্থিত। পুরোহিতের গলায় মালা, তিনি আসনে উপবিষ্ট, রামায়ণ পড়িবার সময় কখন স্বর উচ্চে উঠিতেছে, কখন বা নীচে নাবিতেছে—এবং সেই ছন্দানুসারে তাঁহার দেহ আন্দোলিত হইতেছে। অনেকগুলি চড়াইপাখী এই ভক্তবৃন্দের মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে, এবং বড় বড় কাক, নিদ্রিত গরুদের কাঁধের উপর লাফাইয়া লাফাইয়া বসিতেছে। হিন্দুধর্ম্মেরই এইটি বিশেষ লক্ষণ, এই ধর্ম্ম মুক্তবায়ুতে অনুষ্ঠিত। পূজার এই পবিত্র স্থান—এইখানে, মন্দুরা, পক্ষীশালা ও মন্দির সকলই একত্রিত। পুরোহিতের পশ্চাতে, দালানের প্রান্তদেশে, অন্ধকারাবৃত একটা দেব-সিংহাসন, তাহাতে একটা পুত্তলিকা দেখিতে পাওয়া যায়—কালো-মুখ-ওয়ালা একটি ছোট পুতুল পার্ব্বতী, লাল-কাপড়-পরা দুটি সিংহ পাহারা দিতেছে। তাঁহার নীচে তাঁহার স্বামী মহাদেব; স্বয়ং মহাদেব নহে—তাঁহার লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপিত। লিঙ্গমূর্ত্তি প্রাণের রূপক-চিহ্ন। বন্ধ্যা স্ত্রীলোকেরা এবং স্বামী-প্রার্থী যুবতীরা এইখানে প্রার্থনা করিতে আইসে।

লোকপূর্ণ চৌরাস্তার অপর ধারে, মন্দিরের সম্মুখে, মহারাজার বিদ্যালয় সমুত্থিত। বায়ুমন্দিরের ন্যায় ইহারও গঠন অদ্ভুত ও রং গোলাপী; আমি দেখিয়া মনে মনে তারিফ করিতেছিলাম, এমন সময়ে বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র আমাকে আহ্বান করিয়া ভিতরে লইয়া গেল। কালেজের প্রধান অধ্যক্ষের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দেওয়া হইল; তিনি একটা অন্ধকেরে ছোট ঘরে, রাশীকৃত কেতাবের সম্মুখে বসিয়াছিলেন। তাঁহার হিন্দু-মুখশ্রী অতি মধুর, অতি সুন্দর, একটু চিন্তান্বিত, সমস্ত মুখের গঠন বিদ্যানুরক্ত ব্যক্তির ন্যায় কৃশ ও উন্নতললাটসম্পন্ন; তাঁহার পরিচ্ছদের মধ্যে সাদাসিধা একটি কালো রঙের লম্বাচাপ্‌কান মাত্র। অতি সংযত অঙ্গভঙ্গীর

সহিত, খুব খাঁটি ইংরাজিতে দুইচারিটি স্বাগতোক্তি ব্যক্ত করিয়া আমাকে পাঠশালার মধ্যে লইয়া গেলেন। উচ্চ শ্রেণী ছাত্রদিগের পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হওয়ায় তাহারা তজ্জন্য বাড়িতেই প্রস্তুত হইতেছে, কালেজে আইসে না; কেবল কালেজের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদিগকে দেখিলাম। স্তম্ভ-শোভিত বৃহৎ শালার মধ্যে, এক-এক দল ছাত্র, এক একটি শিক্ষককে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। চৌকি নাই, বেঞ্চ নাই, ডেস্ক নাই। আমরা প্রবেশ করিবামাত্র সকলে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং আগ্রহ ও ভদ্রতার সহিত অত্যন্ত অবনত ভাবে আমাদিগকে সেলাম করিল। কিন্তু পাঠশালার আর একটি কাম্‌রায় কতকগুলি ছাত্র দাঁড়াইল না—বসিয়া রহিল। প্রধানাধ্যক্ষ বলিলেন, "এই বিশেষ শ্রেণীটি কেবল সূর্য্যবংশীয় রাজপুত্র ও ওম্‌রাহদিগের পুত্রদিগের জন্য রক্ষিত। ইহারা বংশগর্ব্বে গর্ব্বিত, তাই আমাদিগকে সেলাম করিল না।"

এখানকার সমস্ত অধ্যাপনা-কার্য্য সরকারী ব্যয়ে দেশীয় অধ্যাপকগণ-কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয় এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা রাজ-সরকারে কাজকর্ম্ম পাইয়া থাকে। এখানে অঙ্কশাস্ত্র, ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য, ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষা, পারস্যভাষা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত, কালেজের প্রধানাধ্যক্ষ বলিলেন, উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগকে সংস্কৃত ও পালী ভাষা এবং ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ পারস্য ও আধুনিক দর্শনশাস্ত্র বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হয়। ষ্টুয়ার্ট মিল এবং স্পেন্সর রীতিমত পঠিত হয়। কালেজের প্রধানাধ্যক্ষ বাঙ্গালী, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার সঙ্গে বিবিধ বিষয়ে কথা-বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন; দেখিলাম, ইংলণ্ডে—এমন কি সমস্ত য়ুরোপে আজ কাল যাহা কিছু হইতেছে তিনি তদ্বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞ। তিনি ফরাসী পণ্ডিত বুর্‌নুফ্, বার্থলেমি স্যাঁৎ হিলোয়ার,

বের্‌গেইন্ এবং ফরাসী দেশীয় সংস্কৃতপণ্ডিতদিগের উল্লেখ করিয়া প্রভূত প্রশংসা করিলেন। অবশেষে বলিলেন—"মোদ্দা কথা, য়ুরোপের বিষয় আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহা ইংলণ্ডের ভিতর দিয়া। ছাত্র যুবকেরা উচ্চশিক্ষার শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া ইংরাজি প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করিতে আরম্ভ করে। সেক্সপিয়ার, মিল্টন, (হিন্দু মস্তিষ্কের পক্ষে সুন্দর আরম্ভ) তৎপরে অ্যাডিসন, পোপ্—তাহার পর দর্শন ও বার্ত্তা-শাস্ত্রের গ্রন্থকার লক্, হিউম, অ্যাডাম স্মিথ্, বর্ক, অষ্টাদশ ও উনবিংশতি শতাব্দীর লেখকগণ, স্পেন্সর পর্য্যন্ত সমস্তই পঠিত হয়। ইহার মধ্যে স্পেন্সরের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তবে, ফরাসী ও জর্ম্মান লেখকদের রচনা-সকল যাহা কিছু আমরা জানিতে পাই, তাহা মূল হইতে না—ইংরাজি অনুবাদ হইতে। সাধারণতঃ ফরাসী ও জর্ম্মান ভাষা আমরা প্রায় কেহই জানি না। কিন্তু আজকাল ইংলণ্ড ছাড়া অন্য দেশের প্রতিও আমাদের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। হেগেল, ফিখ্‌টের সহিত আমরা ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত নহি বটে, কিন্তু আমরা প্রাচ্য দর্শন-শাস্ত্র পাঠ করিয়া থাকি; বিশেষতঃ উপনিষদ্ ও প্রাচীন বেদান্ত-শাস্ত্র—উহার মধ্যেই স্পিনোজা, কাণ্ট্, হেগেল, সপেন্‌হয়ার সমস্তই একাধারে পাওয়া যায়।" ... ...

একটু একটু করিয়া তিনি ক্রমশঃ মাতিয়া উঠিলেন—ক্রমে দেখিলাম তাঁহার স্বদেশীয় প্রাচীনশাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি। তিনি বলিলেন, "পাঁচ ছয় বৎসর হইতে, আমাদের স্বদেশীয় শাস্ত্রের অনুকূলে স্রোত ফিরিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে, ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে, কলিকাতার লেখকেরা হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্নিহিত দুর্নীতি ও অযৌক্তিকতার উল্লেখ করিয়া বিস্তর নিন্দা করিত। এখন আমরা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি, হিন্দুধর্ম্মের অতিরঞ্জিত উক্তিসকলের মধ্যেও

একটা গভীর তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন আছে। এখন আমাদের চিন্তাশীল লেখকেরা হিন্দুধর্ম্ম সমর্থন করিয়া থাকেন। আমাদের এখন এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষাটি বলবতী হইয়াছে যে, আমরা আপনাতে আপনি ফিরিয়া আসি—আমাদের নিজত্ব ফিরিয়া পাই। দেখুন, মহারাজা এই ইংরাজী ব্যাপার-সকল এখানে তো প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, কালেজ, মিউজিয়ম্, শ্রমশিল্প-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে কিছুই করেন না। তাঁহার "অম্বর" প্রাসাদে কালীদেবীর সম্মুখে ছাগ বলি হয়। আমরা সাঙ্কেতিক চিহ্নের মধ্যে উদ্দেশ্য দেখিতে পাই, অক্ষরের মধ্যে অর্থ দেখিতে পাই—যে সকল বাহ্য অনুষ্ঠান অজ্ঞ সাধারণের জন্য কল্পিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে গূঢ় অভিপ্রায় আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে সেরা বুদ্ধিমান বাঙ্গালার নব্য সম্প্রদায় যে ইংরাজী একেশ্বরবাদ এত আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই একেশ্বরবাদের প্রতিকূলে আজকাল উল্টা স্রোত বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা এখন বুঝিতেছি, উহা অপেক্ষা একটা গভীরতর তত্ত্বের আমরা অধিকারী এবং সেই তত্ত্বটি আমাদের দেশের নিজস্ব ধন। স্পেন্সরের লেখা আমরা পড়িতে ভালবাসি, তাহার কারণ স্পেন্সরও ঈশ্বরের ব্যক্তিগত অস্তিত্বের বিরোধী। তাঁহার মতে ঈশ্বরের সগুণ কল্পনা মানবীকরণের প্রকারান্তর মাত্র। তাঁহার মতে ঈশ্বরের স্বরূপ অজ্ঞেয়, অনির্ব্বচনীয়, এক, কিন্তু সেই এক হইতেই কল্পে-কল্পে বিবিধ জীব ও সর্ব্বপ্রকার আকার ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইতেছে, তাই তাঁহার লেখা আমাদের বেদান্তের ব্রহ্মকে অনেকটা স্মরণ করাইয়া দেয়।"

এই হিন্দু যাহা বলিলেন তাহা কি সত্য? ভারতবর্ষ আত্ম-চেতনা লাভ করিয়া সত্যই কি ইংলণ্ডীয় জ্ঞান বুদ্ধির অধীনতার

যুগ-কাষ্ঠ আপনার স্কন্ধ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে? সত্যই কি ভারতবর্ষ জগৎ ও জীবন সম্বন্ধীয় স্বকীয় মতকে ইংরাজী জাতীয় মতের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিতেছে? মুসলমানের অত্যাচারে হিন্দুর মস্তিষ্ক অনেক দিন পর্য্যন্ত অসাড় হইয়াছিল, এখন কি ব্রিটানিয়ার শান্তি-ছায়ায় থাকিয়া সেই মস্তিষ্ক কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে? কোথা হইতে এইরূপ হইল? যাহা হউক এ বড় আশ্চর্য্য দৃশ্য—দুইটি বিপরীত সীমায় মানবজাতি পরস্পর মুখামুখী করিয়া অবস্থিত। এক দিকে উদ্যম, কার্য্যকরী ইচ্ছাশক্তি, ইংরাজী তেজোভাব, আর এক দিকে হিন্দুর চিন্তা-কল্পনা—সেই দার্শনিক স্বপ্নদর্শনের প্রবণতা, যাহার প্রভাবে চিন্তা বিজয়ী হইয়া বাসনা ও মায়ার উপর প্রভুত্ব লাভ করে এবং মনের সমস্ত কার্য্যকরী প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করিয়া ফেলে।

... ...

নেত্রের তৃপ্তি সাধন করিয়া, একাকী সেই আশ্চর্য্য গোলাপী রাস্তার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া, বিচিত্রবর্ণের আনন্দে প্রাণকে পূর্ণ করিয়া, এই জয়পুরের অদ্ভুত কল্পনায় উন্মত্ত হইয়া আজিকার দিনটা অতিবাহিত করিলাম। পরে, নগরের বাহিরে গিয়া যে পথটি অম্বরের দিকে গিয়াছে সেই পথটি অনুসরণ করিলাম। শুভ্র সুন্দর একটি কটিবন্ধের ন্যায় এই পথটি, ক্ষুদ্রতরু-প্রমাণ অদ্ভুত এক-প্রকার হরিদ্বর্ণ ঘাসের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। এই কণ্টকাকীর্ণ পুষ্ট ঘাস অনেকদূর পর্য্যন্ত ভূমিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই অচল কঠিন উদ্ভিজ্জ যেন পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন গ্রহের বলিয়া মনে হয়। এই ঘাসের অরণ্যের অপর প্রান্ত হইতে, পুরাকালের ইমারৎসকল—শত শত অট্টালিকা, শত শত মর্ম্মর-প্রস্তরের মন্দির, উজ্জ্বল সূর্য্যরশ্মির মধ্যে ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে।

লাল ও নীল পরিচ্ছদভূষিত নরনারীর দল আনন্দ-মনে চলিয়াছে। এত ময়ূরের ঝাঁক্ আমি কখনও দেখি নাই—আর এমন সুন্দর ময়ূর। পথের মধ্যেই ময়ূরেরা বিচরণ করিতেছে এবং তাহাদের মণিময় পাখা সূর্য্যালোকে ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে। এই ময়ূরেরা মুক্ত অথচ পোষা, ইহারা কাহারও সম্পত্তি নহে এবং বিশ্বস্ত ভাবে লোকের মধ্যে বাস করিতেছে। সকল প্রকার নিরীহ জীবজন্তু হিন্দুদিগের নিকট পবিত্র; ময়ূরও এই কারণে হিন্দুদিগের সেব্য—তাহাদিগকে ছোলা খাইতে দেওয়া লোকে পুণ্য কার্য্য বলিয়া মনে করে। আমার ভৃত্য ছেদিলাল, আমাকে গম্ভীর ভাবে বলিল, "এই ময়ূরেরা কাহারও কিছু হানি করে না, কিন্তু ইংরাজেরা এমনি দুষ্ট, ইহা-দিগকে পাথর ছুঁড়িয়া মারে।"

আরও দূরে, একটি পরিত্যক্ত প্রাসাদ, বুনো ঘাসে সবুজ হইয়া গিয়াছে—মনে হয় যেন উহা একটি প্রকাণ্ড সরসীর আর্শিতলে প্রতিষ্ঠিত। ইহার কালো বিষাক্ত জল অল্প অল্প ঝিক্ ঝিক্ করি-তেছে। ইহার তটদেশে কুম্ভীরেরা স্থিরভাবে নিদ্রা যাইতেছে। চারিদিকে সুন্দর স্বর্ণোজ্জ্বল পর্ব্বত-শ্রেণী আলোকে পরিপূর্ণ এবং প্রশান্ত নীল গগনকে বেষ্টন করিয়া আছে। সূর্য্যের মৃদু উত্তাপ, বায়ু সূক্ষ্ম, লঘু, সুখস্পর্শ এবং একটু মাদকতা-বিশিষ্ট। ... ...

তাড়াতাড়ি আমরা মহারাজার প্রাসাদ দেখিতে গেলাম। আস্তাবলে শত শত আরব ঘোড়া পদাস্ফালন করিতেছে, কুক্কুর-গৃহে শিকারী কুক্কুর সকল রহিয়াছে, হাতিশালায় হাতিরা শৃঙ্খলা-বদ্ধ, উদ্ভিজ্জ-মণ্ডপে বিবিধ উদ্ভিজ্জ রক্ষিত। এইবার গোলাপী নগরের নিকট বিদায় লইয়া যাইতে হইতেছে। ষ্টেসনের নিকটে, হিন্দুস্থানী পুস্তকরাশির ভারে ভারাক্রান্ত একটি অল্পবয়স্ক রাজপুত ছাত্র আমাকে মধুর ভাবে "গুড্ আফ্‌টরনুন্" বলিয়া অভিবাদন করিল।

য়ুরোপীয় সাজসজ্জায় বেষ্টিত রেল-গাড়িতে আবার যখন উঠিলাম, তখন মনে হইল যেন এমন একটি উন্মত্তকারী রঙ্গালয় হইতে বহির্গত হইলাম যেখানকার নাট্য-দৃশ্য দেখিয়া আত্মহারা হইতে হয়, যেখানে সেক্সপিয়রের কমেডির ন্যায় কিম্বা ওয়াটোর প্যাস্টোরালের ন্যায় বাস্তবকে ভুলিয়া যাইতে হয়। এই পিতৃবৎ-শাসিত জনসমাজ, এই সকল গোত্র, এই সকল সূর্য্যবংশীয় অশ্বারোহী রাজপুত ঠাকুরের দল, এই সুবিজ্ঞ রাজা যাঁহাকে প্রজারা ভালবাসে, যিনি স্বেচ্ছাতন্ত্রী * পিতৃস্থানীয়; ঢালবল্লমধারী এই সকল যোদ্ধৃগণ, ইহাদের অদ্ভুত শ্মশ্রুরাজি, ইহাদের সৌখীন পরিচ্ছদ, রাস্তার হাস্যময় সুখী লোকজন, নীলরঙের কুকুর, শিকারী নেকড়ে বাঘ—এই সমস্তই গীতিনাট্যের জগৎ—স্বপ্নজগৎ। কর-মর্দ্দিত ষ্ট্রবেরি-ফলের রঙের ও গোলাপী রঙের বাড়ীসকল যাহা পাথরের বলিয়া মনে হয় না, ছোট ছোট পাহাড়ের উপর বুরুজ-শোভিত দুর্গ-নিবাস, অদ্ভুত লঘু-ধরণের ইমারৎসকল, 'সূর্য্য-মন্দির' 'বায়ু-প্রাসাদ' 'মেঘ-প্রাসাদ', 'পান্নার দ্বার', "শোভা-শালা" বাষ্পবৎ লঘু পর্ণ-জাতীয় (Fern) উদ্ভিজ্জ-পরিপূর্ণ উদ্ভিজ্জ-মণ্ডপ, ঘাসে পরিপূর্ণ মাঠ, ঝোপ-নিবাসী নীলকণ্ঠ ময়ূর, কৃষ্ণনলিলা-সরসা-শোভিত পরিত্যক্ত প্রাসাদ মন্দির—এই সমস্ত গীতিনাট্যের দৃশ্যাবলী। এখানকার জীবনযাত্রাও গীতিনাট্যের উপযুক্ত। এখানে কোনও দায়িত্বপূর্ণ গাম্ভীর্য্য নাই, কোনও গুরুতা নাই, দুঃখকষ্টের কোনও ভাব নাই—এই হাস্যময় শিল্পাজাতির আর কোনও কাজ নাই—আর কোনও ভাবনা নাই; ইহারা কেবল মর্ম্মর-প্রস্তরের ছোট-ছোট

* তাহার দৃষ্টান্ত, রাজার অনুমতি ব্যতীত জয়পুরে ফোটোগ্রাফ্ তোলা যায় না।

দেবমূর্ত্তি পশুমূর্ত্তি গড়িতেছে, জরির জুতা তৈয়ারি করিতেছে, গৃহ-প্রাচীর নীল রঙের ছবির দ্বারা চিত্রিত করিতেছে, সুন্দর আরব ঘোড়ায় সওয়ার হইতেছে, আকাশের পক্ষীদিগকে পোষণ করিতেছে, ঘুড়ি উড়াইতেছে এবং বিশ্বস্তচিত্তে মুক্ত আলোকে সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। হাঁ! ইহাদের জীবন সাদাসিধা, সুখী, শিশু-প্রায়—ইহাদের মধ্যে সঙ্গীতের বিরাম নাই—আনন্দের অবসান নাই। আমাদের দুঃখময় তমোময় য়ুরোপে ফিরিয়া যাইবার সময় আমি এই সমুজ্জ্বল কবিতাময় স্বপ্নটিকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছি।

ভারতবর্ষে বারাণসী।

নাট্য দৃশ্যের হঠাৎ পরিবর্ত্তন হইল। ২৪ ঘণ্টা উত্তর বাঙ্গলার রেলপথে ও ২১ ঘণ্টা গ্রেট পেনিনসুলার রেলপথে ভ্রমণ করিয়া কাল সন্ধ্যার সময় এখানে পৌঁছিলাম। পথে কিছুই বিশেষ দেখিবার নাই। মোঙ্গলীয় শীতল (দার্জিলিং) প্রদেশ হইতে নামিয়া একেবারে ভারতের পুণ্যভূমিতে—সনাতনী গঙ্গাদেবীর পুণ্য তটে আসিয়া উপস্থিত।

এইখানেই সেই প্রাচীন ভারতবর্ষ—হিন্দুর ভারতবর্ষ। এখানে য়ুরোপীয়েরা বাস করে না, এখান দিয়া কেবল যাতায়াত করে মাত্র। ইংরাজ ইহার কিছুই পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই; বণিক কিম্বা কারখানাওয়ালা হইয়া ইংরাজেরা এখানে রীতিমত আড্ডা গাড়ে নাই। এই নগরী—এই হিন্দুরা—এই সকল মন্দির দশ

শতাব্দি পূর্ব্বে যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে। ইহা হিন্দুজগতের হৃদয়-দেশ—সেই অগ্নিস্থান যেথানে ব্রাহ্মণ্য অনল সর্ব্বদাই প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে। সেই পুরাকালের ব্রাহ্মণেরা, যাঁহারা পুত্র-মুখ দেখিবার পর ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া বিজনে বিশ্বজনীন মূলতত্ত্বের ধ্যান করিতেন, তাঁহারা এই বারাণসী কিম্বা এই গাঙ্গেয় উপত্যকার নিকটবর্ত্তী প্রদেশের অধিবাসী। এই স্থানেই হিন্দু-চিন্তার পরিণামস্বরূপ মহা-মহা ছয়টা দর্শন বিরচিত হইয়াছিল। পঞ্চবিংশতি শতাব্দিতেও এই নগর বিখ্যাত ছিল। হাঁ, যখন নিনিভার সহিত ব্যাবিলনের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, যখন টায়ার মধ্যধরাশায়ী-সাগরের উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করিতেছিল, যখন এথেন্স নগরের হাটবাজার বাগ্মীদিগের বাক্যোচ্ছ্বাসে প্রতিধ্বনিত হইত এবং সেখানকার মন্দিরসকল প্রস্তর-মূর্ত্তিতে পূর্ণ হইতেছিল; যখন রোম, কৃষকদিগের নিবাসস্বরূপ একটি ক্ষুদ্র নগরমাত্র ছিল, যখন পুরাতন মিসরীয় ধর্ম্মমতের প্রাদুর্ভাব ছিল, সেই সময়ে এই প্রখ্যাত মহানগরী আজিকার ন্যায় তখনও গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণে পরিপূর্ণ। তখনও ব্রাহ্মণদিগের যে সকল লক্ষণ ছিল, এখনও তাহাই দেখা যায়; কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানের পীড়নে দেহযষ্টি একেবারে নত হইয়া পড়িয়াছে, আপনার মধ্যে আপনি পুঁটুলি বাঁধিয়া আছে, দার্শনিক স্বপ্নদর্শনে নিমগ্ন, চিন্তার সূক্ষ্ম তন্তুজাল আরও সূক্ষ্মতর করিতে করিতে মাথা ঘুরিয়া যাইতেছে—খেয়াল দেখিতেছে—তাঁহাদের নিকট এই নীরেট জগৎ স্খলিত গলিত হইয়া এমন একটি প্রশান্ত নাস্তিত্বে পরিণত হইয়াছে, যেখান হইতে অস্তিত্বের প্রতীয়মান আবির্ভাব মাত্র নিরন্তর সমুত্থিত হয়। ইহাদের মধ্যে শাক্যমুনি একজন। এখান হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরে ইহাঁর জন্মস্থান এবং পাঁচ বৎসর কাল ধ্যান ধারণার সাধনা করিয়া বারাণসীতে ইনি

নিজ মত প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। আজি আমাদের পুরা-কালীন পাশ্চাত্যের কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। সে জগৎ একেবারেই মৃত—তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে—কালের অন্ধকারে তাহাকে একেবারেই গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এই কাশী নগর চির-কালই ভারতের সেই মহিমান্বিত কাশীধাম।

প্রভাতে, যখন সূর্য্যমণ্ডল স্পন্দিত-হৃদয়ে গঙ্গার পশ্চাতে উদিত হয় তখন পঁচিশ হাজার ব্রাহ্মণ, হিন্দু-জনতার সম্মুখে, নদীর তটদেশে উপবিষ্ট হইয়া এখনও তারকার উদ্দেশে, পুণ্য নদীর উদ্দেশে, আদিম শক্তিসমূহের উদ্দেশে, প্রাণের দৃশ্যমান উৎপত্তি স্থানসমূহের উদ্দেশে, সেই প্রাচীন বৈদিক স্তুতিগান সকল পাঠ করিয়া থাকে। রোম নগর ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের নিকট যত না পবিত্র, কাশী হিন্দুর নিকট তদপেক্ষা অধিক পবিত্র। উহার প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড পবিত্র। কাশীতে যাহার মৃত্যু হয়, কোনও মলিনতা কোন পাপই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। খৃষ্টিয়ান হউক, মুসলমান হউক, গোহত্যাই করুক বা গোমাংসই আহার করুক, সে নিশ্চয়ই কৈলাসধামে—শিবলোকে গমন করে। অতএব সেই ব্যক্তি ভাগ্য-বান্, জীবনের শেষভাগ যে কাশীতে কাটাইতে পারে। দুই লক্ষেরও অধিক যাত্রী ভারতের সকল দিক্ হইতে এইখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাদের মধ্যে অনেকে বৃদ্ধ ও মৃতকল্প। দুর্ভাগ্য-বশতঃ যদি কাহারও কাশীপ্রাপ্তি না হয়, অন্ততঃ তাহার অন্তিম ভস্মরাশি কাশীধামে পরে পাঠান হয়। এই উদ্দেশে পাঠান হয় যে, গঙ্গাপুত্রেরা অন্ত্যেষ্টি-মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহার অন্তিম-ভস্ম গঙ্গা-দেবীকে সমর্পণ করিবে। হিন্দুরা বলে, 'কাশী—পুণ্যধাম কাশী—কাশীকে ধ্যান করিলেই শান্তিতে মৃত্যু হয়।'

বাস্তবিকই এই নগরটি অসাধারণ। অন্যত্র, ধর্ম্মাচরণ, প্রকাশ্য

জীবনের এক অংশমাত্র, কিন্তু কাশীতে ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। ধর্ম্ম এখানে সমস্ত গ্রাস করিয়া আছে—মানবজীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত পূর্ণ করিয়া আছে—নগরকে মন্দিরে মন্দিরে ছাইয়া ফেলিয়াছে। উনবিংশতি সহস্রেরও অধিক মন্দির, এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবালয় অসংখ্য। মূর্ত্তির সংখ্যা যদি ধর তো সে কাশীর জনসংখ্যার দ্বিগুণ। প্রায় পাঁচ লক্ষ হইবে। কাল সন্ধ্যায় যখন পৌঁছিলাম, দিনের আলো তখনও ছিল, তাই বেড়াইতে বেড়াইতে নদীর ধার পর্য্যন্ত গেলাম। নগরের আঁকা-বাঁকা গলিসকল অর্দ্ধনগ্ন মানবকুলের গতিবিধিতে পরিপূর্ণ। দেবালয়ের দ্বারের সম্মুখে লোকের বেশি ভীড়। গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণেরা ঠেলাঠেলি করিয়া চলিয়াছে; সন্ন্যাসীরা আসন করিয়া উপবিষ্ট—ভস্মমাখা নগ্নদেহ—স্থির দৃষ্টি—চারিদিকের চঞ্চল গতিবিধির মধ্যে প্রস্তরবৎ অচল।

হলদে ফুলের হার, মালা, প্রস্তরের শিবলিঙ্গ প্রভৃতি নানাবিধ ধর্ম্মোপকরণে এখানকার দোকান সকল পরিপূর্ণ। ঘরের দেয়ালে, দ্বারের উপরিভাগে, কুলঙ্গির উপর, নানাপ্রকার কদাকার দেবমূর্ত্তি—কাহারও বা গজমুণ্ড—কাঁহারও বা গায়ে সাপ জড়ানো। স্থানে স্থানে কূপ—তাহা হইতে পচা ফুলের দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। সেই সকল কূপে দেবতার বাস—তাহার চারিদিকে লোকের অত্যন্ত ভীড়। প্রাচীরের গায়ে নীলরঙে চিত্রিত হিন্দু দেবদেবীর পৌরাণিক কাহিনী। দেবদেবীর অশ্লীল মূর্ত্তিসকল মালার আকারে মন্দিরের চারিদিকে বেষ্টিত। এত দেবদেবীর মূর্ত্তি যে, বড় বড় মন্দিরেও যেন আর ধরে না—রাস্তার মধ্যে ছোট ছোট দেবালয়েও দেবতাদিগকে আশ্রয় লইতে হইয়াছে—তাহাতে লম্বোদর গণেশ অথবা ভীষণ-মূর্ত্তি কালীদেবী অধিষ্ঠিত। মন্দির-বেদীর উপর যে জুঁই ফুল

থাকে তাহাতে গঙ্গাজলের ছিটা দেওয়া হয়। এই গঙ্গাজলে ভিজিয়া ভিজিয়া ফুলসকল পচিয়া উঠে—তৎপরে গোবর ও এই পচা ফুলে মিশিয়া একপ্রকার কর্দ্দম উৎপন্ন হয়। এই কর্দ্দমের উপর দিয়া পিছলিয়া পিছলিয়া চলিতেছি—আর দুর্গন্ধ ভোগ করিতেছি। এই মানব-জনতার মধ্যে আবার বানরেরা লাফালাফি করিতেছে—খেলিতেছে—ঘরের ছাদে বসিয়া আছে; এবং বন্ধন-মুক্ত গাভীসকল ইতস্তত বিচরণ করিয়া ফুল খাইতেছে। প্রাচীন হিন্দু মহাকাব্যে অসংখ্য যুগযুগান্তের কথা, অসংখ্য দেবদেবীর কথা, অসংখ্য জীবজন্তু উদ্ভিজ্জের কথা পড়িয়া যেমন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতে হয়, এইখানকার ব্যাপারসকল দর্শন করিয়া আমার কতকটা সেই রকম মনের ভাব হইয়াছে। আমাদের স্বাভাবিক মনের গতি ও অভ্যাস যেন একেবারে ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। মনে হয় যেন এমন একটা দেশে আসিয়াছি যেখানে মানুষ পায়ে না হাঁটিয়া মাথায় হাঁটে। এই মানবজাতি যেরূপে চিন্তা করে, অনুভব করে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে তাহা সম্পূর্ণ আমাদের বিপরীত—আমাদের ভাবের সঙ্গে আদৌ মিশ খায় না। কাশীতে আসিয়া মনে হয়, যেন খেয়াল দেখাই এখানকার স্বাভাবিক অবস্থা। ......

পাঁচটার সময় উঠিলাম, সাড়ে ছটার সময় নদীর ধারে উপনীত হইলাম। প্রভাতের তরুণ আলোকে দিগন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান তরল রজতবৎ শুভ্রকান্তি। বৃহৎ গঙ্গা নিজ শ্যামল বক্ষ উদ্‌ঘাটন করিয়া, কর্দ্দমময় ভাঙা-ভাঙা তরঙ্গলহরী বিস্তার করিয়া দুই কূলের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। একদিকে বালুকাময় বিস্তীর্ণ মরু—আর একদিকে মন্দির, প্রাসাদ, মসজিদ, মর্ম্মর-প্রস্তরের প্রাচীর—যাহার রেখাসূত্র গোলাবী কুয়াশার গভীরতম দেশে ক্রমশ মিলাইয়া গিয়াছে। ঘাটের প্রশস্ত ধাপসকল উদারভাবে নদী পর্য্যন্ত নামি-

য়াছে এবং সূর্য্যালোকে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। এইখানে হিন্দুদিগের ভীড়। যাত্রী, পুরোহিত, ভক্তের দল সবাই প্রাভাতিক অর্চ্চনা সমাধা করিবার জন্য—উদীয়মান সূর্য্যকে ও গঙ্গাদেবীকে পূজা দিবার জন্য এখানে সমাগত। সহস্র সহস্র লোক। গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণেরা—ত্রিবলীশোভিত লম্বোদর—দীপ্তিমান মুণ্ডিত মস্তক—বৃহৎ বৃহৎ তৃণাচ্ছাদিত ছত্র-তলে, প্রস্তর-ফলকের উপর উপবিষ্ট হইয়া পথিকদিগের নিকট শাস্ত্র হইতে শ্লোক পাঠ করিতেছে। শ্যামবর্ণ শূদ্রেরা মুণ্ডিতমস্তক, কেবলমাত্র অল্প এক গুচ্ছ কেশ ঘাড়ের দিকে লম্বমান—অর্দ্ধ-নগ্ন চটুল দেহ। স্ত্রীলোকেরা উজ্জ্বল রঙের কাপড়ে আপাদমস্তক আচ্ছাদিত। তাহারা দাঁড়াইয়া সূর্য্যের দিকে বাহু উত্তোলন করিয়া করযোড়ে পূজা করিতেছে। যতই আমাদের নৌকা জলের উপর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল ততই মন্দির ও লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। চারি শত ফুট প্রশস্ত বড় বড় সোপানশ্রেণী প্রকাণ্ড পিরামিডের ন্যায় ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, তাহাদের সহস্র সহস্র ধাপ—সেই ধাপসমূহের সমান রেখাপাত। গুরু-ভার অষ্টকোণ স্তম্ভসকল জলমধ্যে নিমগ্ন; হর্ম্ম্য-শ্রেণীর চৌকোনা সম্মুখভাগ—লাল পাথরে ফুলকাটা বড় বড় চূড়া—মার্ব্বলের ভিতর খোদা কুলঙ্গি সকল একটার পর একটা দৃষ্টিপথে আসিতেছে। পুরাতন মিসরের ন্যায়, আসিরিয়ার পৌরাণিক নগরের ন্যায় এখানে পাথরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তূপ, জ্যামিতিক গঠন-প্রণালী-অনুসারে উপর্য্যুপরি ন্যস্ত। এই সকল অট্টালিকার নিম্নে বহুপুরাতন নদীর ধারে শতসহস্র হিন্দু গতিবিধি করিতেছে—ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছে।

চারি ঘণ্টা ধরিয়া আমি নদীর উপর নৌকা করিয়া যাতায়াত করিলাম—এই সকল অশেষ বিচিত্রতা—আকার ও ভঙ্গীর অনন্ত তরঙ্গ আমি কি করিয়া বর্ণনা করিব? আলোক-ধবল প্রশস্ত

ধাপের উপর বাঁধা পোস্তার ধারে - ভগ্নাবশিষ্ট মন্দিরের রাশীকৃত প্রস্তরের উপর—আরও উচ্চে গবাক্ষের উপর—প্রকাণ্ড প্রস্তর-স্তূপের ছাদে— তৃণময় ছত্রারণ্যের তলে—শ্যামল দেহসকল পিল্-পিল্ করিতেছে - বিচিত্র রঙের বুদ্বুদ যেন ভাসিতেছে। পাঁচটি নগ্নদেহ একটা থামের উপর হইতে এক লম্ফে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল—জলকণার স্ফুলিঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

তাহাদের পশ্চাতে ব্রাহ্মণেরা বিড়্বিড়্ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে বৃক্ষশাখা আস্ফালন করিয়া জলে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে। আরও নীচে, গম্ভীর ও উন্নতকায় স্ত্রীলোকেরা জল হইতে উঠিতেছে—সিক্ত নীল সাড়ী হইতে টস্টস্ করিয়া জল পড়িতেছে। জনতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, লোহিত পট্টবস্ত্রে আবৃত হইয়া, শাস্ত্রানুমোদিত আসন রচনা করিয়া, একটা প্রস্তরস্তূপের উপর উপবিষ্ট হইয়া এক ব্যক্তি একদৃষ্টে সূর্য্যের পানে চাহিয়া আছে—কত অদ্ভুত ভঙ্গী ও মুদ্রা করিতেছে, দেখিলে মনে হয় উন্মাদগ্রস্ত; দুইজন স্ত্রীলোক এক হস্তে নাক টিপিয়া ধরিয়া আছে, অপর হস্তে বুক চাপ্ড়াইতেছে; একটি বৃদ্ধা একেবারে বক্রীভূত—সর্ব্বাঙ্গ কম্পমান—তাহার গাত্রলগ্নসিক্ত সাড়ী হইতে তাহার শীর্ণতার রেখা বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে—বলীরেখাঙ্কিত হস্ত যোড় করিয়া সে ছয়বার পাক্ দিয়া ঘুরিতেছে। আর সকলে, ওষ্ঠাধরের দ্রুত স্পন্দন সহকারে, মধ্যে মধ্যে করপুটে জল উঠাইয়া সম্মুখে নিক্ষেপ করিতেছে।

... ...

শিবের নিকট, গণেশের নিকট, সূর্য্যের নিকট, অসংখ্য স্তুতি বন্দনা উত্থিত হইতেছে। এক মুহূর্ত্তের জন্য এক একবার সেই গুরুভারাক্রান্ত অভিভূতভাব হৃদয়ে উপলব্ধি করা যায়, যে ভাব

পুরুষানুক্রমে ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইয়া আর্য্য-মস্তিকের গঠন-পরিবর্ত্তন করিয়া হিন্দুদর্শন ও হিন্দুকাব্যের আকারে পরিণত হইয়াছে। এই-রূপ উপলব্ধি হয় যে, বিশেষ বিশেষ নশ্বর সত্তার পশ্চাতে একটা মহাশক্তি বিদ্যমান, যে শক্তি সর্ব্বপ্রকার পদার্থ ও সত্তা উৎপাদন করে, যাহা অবিনশ্বর, যাহা অনন্তকাল বর্ত্তমান, সহস্র সহস্র জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে যাহার প্রকাশ এবং যাহার কদাচ ক্ষয় হয় না। এই শক্তিকেই হিন্দুরা পূজা করে—এই শক্তিপূজাই তাহাদের ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি। এই কথাটা যদি একবার উপলব্ধি করা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার অসঙ্গতির ব্যাখ্যা আপনা আপনি হইয়া যায়। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে অসভ্যজাতিসুলভ পৌত্তলিকতার সহিত অতিসূক্ষ্ম তত্ত্বচিন্তার সম্মিলন হইয়াছে। এই হিন্দুরা তেত্রিশকোটি দেবতা মানে, তা ছাড়া পঞ্চভূত, পশুপক্ষী বৃক্ষ তারকা প্রস্তর সকলকেই পূজা করে। জগদীশ্বরবাদ—একেশ্বরবাদ—বহুদেববাদ সমস্তই ইহার মধ্যে একাধারে বর্ত্তমান। বিশ্বের সার্ব্বভৌমিক সত্তাকে কিম্বা তাহার বাহ্ প্রকাশকে এক করিয়া দেখ, কি বহু করিয়া দেখ, জড়ভাবে দেখ, কি আত্মাভাবে দেখ—যে ভাবে দেখো, তাহা-রই উপর এই বিশেষ বিশেষ মতবাদ নির্ভর করে। একবার ইহা বুঝিতে পারিলে তাহাদের বাতুল কল্পনার অর্থ পাওয়া যায়, তাহাদের কাব্যগত অদ্ভুত স্বপ্নকাহিনীর ব্যাখ্যা হয়। হিন্দুরা প্রকৃতির মধ্যে মগ্ন হইয়া গিয়া, হস্তী বানর ভল্লুক কীট পতঙ্গ উদ্ভিজ্জ সকলকেই আপনাদের সমকক্ষ সঙ্গী করিয়া লইয়াছে। অধিকন্তু, তাহারা একটা মহাপ্রাণ উপলব্ধি করিয়াছে, যে প্রাণ তরল তরঙ্গ-ময়, যাহা মরিতেছে, জন্মিতেছে, বৃদ্ধি পাইতেছে এবং যে প্রাণ বিচিত্র ও চিরপরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু যখন আমি এই লোকারণ্যের মধ্যে এই সকল মন্দিরের মধ্যে, মুসলমান মস্‌জিদের দুইটি সমুন্নত

সৌধ-ধবল মিনার সুনীল গগনপটে অঙ্কিত দেখিলাম তখন আমার একটা খুব তফাৎ মনে হইল। এই মিনার দুটি গগন ভেদ করিয়া কেমন সিধা উঠিয়াছে। প্রার্থনার ঐকান্তিক আগ্রহ—অন্তরের একটি আকুল ধ্বনি যেন মূর্ত্তিমান হইয়া অপ্রতিহতবেগে উর্দ্ধে ছুটিয়াছে। এই মিনারের গঠনে এমন একটি জাতির হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়, যে জাতি অনাড়ম্বরপ্রিয়, ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, একেশ্বরবাদী এবং যাহার হৃদয় প্রবল আবেগে পূর্ণ।
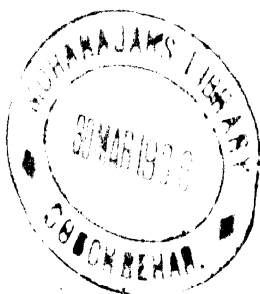
বিজ্ঞাপন।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা।

(সঙ্গীত বিষয়ক মাসিক পত্রিকা)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সংস্কৃত সঙ্গীত-গ্রন্থের অনুবাদ

এবং

বিবিধ হিন্দী ও বাঙ্গলা গানের

সহজ স্বরলিপি

ইহাতে প্রকাশিত হয়।

নং ২০৯ কর্ণওয়ালীসষ্ট্রীট ভারত সঙ্গীত সমাজে প্রাপ্তব্য।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০।